জিহাদের কাফেলা

শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান

জিহাদের কাফেলা

মূলঃ-

শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহঃ)

অনুবাদঃ-

মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

হুংকার প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

জিহাদের কাফেলা

মূলঃ-
শহীদ মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী (রহঃ)।
অনুবাদঃ-
মাওলানা মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

সার্বিক সহযোগীতায়ঃ
মাওলানা নজরুল ইসলাম।

প্রকাশকাল
০৭-০৪-২০০০ইং।
১লা মহররম, ১৪২১ হিজরী।
২৪শে চৈত্র, ১৪০৬ বাংলা।

মূল্যঃ ৩২.০০ টাকা।

হুংকার প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় মরহুম পিতার
রুহের মাগফিরাত কামনায়-

সাইফুল ইসলাম

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ

চৌদ্দশত বছর যাবৎ জিহাদের কাফেলা পৃথিবীর পথ ধরে চলছে, মানব জাতি কে মুক্তির পথে আহবান করছে, শমশীর হাতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে দিক-দিগন্তে। এ কাফেলা কুফুরী শক্তির বাঁধার বিন্ধ্যাচল ডিঙ্গিয়ে হচেছ আগোয়ান নবোদ্যমে।

দ্বীনের পতাকা মুষ্টি চেঁপে ধরে আল্লাহর কালিমা কে গালিব করতে ওরা মারছে ও মরছে। কারো হিম্মত নেই এ কাফেলার অপ্রতিরোধ্য স্রোতকে রুখে রাখতে। বদর প্রান্তরে এ কাফেলার তরবারী কোযমুক্ত হয়, তা আর কোযবদ্ধ হয়নি। হবেনা আর কিয়ামতের আগে। যারা ওদের রাস্তা আগলে দাঁড়ায়, এ দুনিয়া তাঁদের জন্যে জাহান্নামে পরিণত হয়।

গোলাম বাদীর জীবন যাপন করে পরকালে পার হতে হয়। সেখানে আবার তাদের জন্য রয়েছে দরদেনাক শাস্তি। উভয় জাহানের ক্ষতির আশংখায় ওরা মুজাহিদগণের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে খুব কমই অবতীর্ণ হয়। তাই বলে দুশমনদের চেষ্টায় ভাটা পড়েনি। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই কাফির-মুশরিক-মুনাফেক চক্র মুসলিম নিধনে জোটবদ্ধ। কিভাবে মুসলমানদের ঈমান হরণ করা যায় এবং এদের নারীদের ইজ্জত লুষ্ঠন করা যায় কিভাবে ইসলামী শক্তিকে সমূলে শেষ করা যায় এজন্য ওরা বিভিন্ন রাস্তা ইখতিয়ার করেছে। তার মধ্যে ওরা একটি রাস্তায় সবচেয়ে বেশী সফলকাম হয়েছে, তা হল মুনাফেকীর রাস্তা। এ রাস্তায় দুশমনরা কল্পনাতীত ভাবে সফলতা লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগ হতে এ চক্রের কাজ শুরু হয়। নবী (সাঃ) এর যুগে মুনাফেক চক্রের নেতা ছিল আবদুল্লাহ বিন উবাই। আবদুল্লাহ বিন

উবাই ইসলামের যতটুকু ক্ষতি করে ছিল, তার চেয়ে বহুগুণে বেশী ক্ষতি করেছে তার যোগ্য শিষ্য আবদুল্লাহ বিন সাবা।

কেননা রাসূল (সাঃ) মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে যেতেন। পরবর্তী যুগে এটা সম্ভব হয়নি। মুনাফেক চক্র ইসলামের যে ক্ষতি করেছে কাফের বে-দ্বীন সম্মিলিত শক্তি মিলেও তা করতে সক্ষম হয়নি। সম্মুখ যুদ্ধে ওদেরকে পাওয়া যায় না। মুখ দেখলে শত্রু বলে চেনা যায় না। নামায, রোযায়, আচার-ব্যবহারে ওরা একজন আল্লাহর অলীর চেয়ে অনেকাংশে এগিয়ে। এজন্যইতো ইবনে সাবা ইসলামের বৃহৎ ক্ষতি করতে সক্ষম হয়। সে তার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) কে হত্যা করে। তার শিষ্যরা এ ব্যাপারে তাকেও হার মানিয়েছে। তারা হুজুর (সাঃ) এর লাশ মোবারক চুরি করার ফন্দি এটেছিল। এ মুনাফেকদের গাদ্দারীর কারণে ইল্‌মের প্রাচীন নগরী বাগদাদ এক কালে ধ্বংস হয়। বাইতুল মাকদাস ফের দুশমনদের হাতে চলে যায়। এ সকল কুচক্রীদের কারণে ভারত উপহমাদেশ খৃষ্টানদের হাতে চলে যায়। ওরা ইসলামের কর্ণধার আলেম সমাজ কে গুপ্ত হত্যায় খুবই তৎপর। এ মুনাফেক চক্র ইমাম বুখারী (রঃ) এর উপর জুলুম করেছিল। ইমাম গাজালী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ (রঃ) সহ অসংখ্য আলেমের উপর চালিয়ে ছিল নির্যাতনের ষ্টিমরোলার। ওদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে আজ ইরান, ইরাক সহ বহু দেশের মুসলমান। পাকিস্তানে ওদের গুপ্ত হত্যার শিকার হচেছ খ্যাতনামা আলেম সমাজ।

হক নেওয়াজ (রঃ) এ মুনাফেক চক্রের গোমর ফাঁক করে ছিলেন বিধায় তাকে মর্মান্তিক ভাবে শহীদ করা হয়। তারপর এ

মুনাফেক চক্রের মহাতংক জিয়াউর রহমান ফারুকী (রঃ) কে শহীদ করা হয়। তিনি শহীদ হওয়ার পর তার স্থলাভিসিক্ত হন হাবিবুল্লাহ মুখতার (রঃ)। তিনিও এ দুশমনের হাতে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করেন। আরও কত শত মানুষ ওদের হাতে বলি হচেছ, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সুতরাং, সর্বশেষে একথা বলতে পারি যে, মুনাফেক চক্র সম্মুখ যুদ্ধে কামিয়াব না হলেও এ পথে তারা ষোল আনা সফলতা অর্জন করেছে। এ মুনাফেক চক্রের কাজ একটাই, তা হল গুপ্ত হত্যা। তবে ওদের নামের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। রাসূল (সাঃ) এর যুগে ওদের কে মুনাফেক চক্র বলা হত। উসমান (রাঃ) এর যুগে যারা এ কাজ করত তাদেরকে সাবাই চক্র বলা হয়। বর্তমানে আমরা এদেরকে শিয়াচক্র বলে জানি।

এ শিয়া চক্র ইসলামের কত বড় ক্ষতি করেছে এবং করছে জিহাদের কাফেলা বইটি পড়লে আপনারা তা সহজে অনুধাবন করতে পারবেন বলে আমি আশা করি।

শহীদের কাফেলা

আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহের বানী, আজ এই মহা সম্মেলনে আপনাদের সাথে মোলাকাতের সুবর্ণ সুযোগ হয়েছে। এই সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ার জন্য করাচী নিউটাউন এর "সিপাহি সাহাবার সকল সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ পেশ করছি। আমার করাচী সফর বাতিল করার সকল ষড়যন্ত্র বানচাল হওয়ায় এবং আমাকে করাচী আসতে বাঁধা প্রদান করে সরকার ব্যর্থ হওয়ায় করাচীর এ সম্মেলনের আয়োজন কারী ও ব্যবস্থাপকদের কে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। একজন ব্যবস্থাপক অতি আফসোস ও ব্যথা ভরা মন নিয়ে বলতে ছিলেন যে সরকার করাচীতে আমাদেরকে কনফারেন্স করার অনুমতি তো দিতে পারে কিন্তু জিয়াউর রহমান ফারুকীকে করাচীতে প্রবেশের অনুমতি কোনক্রমেই দিবে না। করাচী শহরের দরজা ফারুকীর জন্য খোলা হবে না, কিন্তু তারা আজ আমাদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আজ আমরা নিজেরাই প্রবেশদার উন্মুক্ত করে নিয়েছি। আমার আসার পূর্বে তারা এয়ারপোর্ট রেলষ্টেশন সহ সকল প্রবেশ পথে অনুসন্ধিৎসুর মন মানসিকতা নিয়ে, হরিণের মত সতর্কতা নিয়ে, তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে হোঁ হোঁ করে বিচরণ করতে ছিল আমাকে বাঁধা প্রদানের জন্য। তারা পারেনি আমাকে রুখে রাখতে। নাকাম হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি খেয়ে ঘরে বসে গেছে। বরং রাত দশটা পর্যন্ত তাঁরা এ কথা জানিয়ে শেষ খবর পরিবেশন করেছে যে, ফারুকী এখনও আসতে পারেননি। অথচ তাদের জানা নেই যে, আমি প্রায় চৌদ্দঘন্টা যাবৎ করাচীর মাটিতে অবস্থান করছি এবং কয়েকবার সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছি যে,

আমাদেরকে বাঁধা দিবেন না, প্রয়োজন নেই বাঁধা প্রদানের। সেদিনের কথা স্মরণ করুন, ভুলে যাবেন না সেদিনের কথা, যেদিন শোকরগাতেও আমাদেরকে বাঁধা প্রদান করা হয়েছিল। আমরা পরিস্থিতির মোকাবালা করে বাঁধার বিন্ধ্যাচল ভেঙ্গে চুরমার করে চল্লিশজন পুলিশের নাসিকা রক্তাক্ত করে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে যাই, আর আমার পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তারা বলতে ছিল ফারুকী এখনও আসতে পারেননি। আজকের এ জলসার পরিস্থিতিও ঠিক তদ্রূপ হয়েছে।

হে শ্রোতাবৃন্দ! আপনারা জানেন, এ সভায় আমার আসার দ্বারা সকলের মাঝে জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। যেন নীচের জমিন উপরে এসে গেছে, উপরের জমিন নীচে চলে গেছে। বন্ধুগণ! অতি দুঃখের বিষয়, করাচী শহরে ডাকাত দলের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হয়নি। বদমাইশ ও মাস্তানদের বিচরণ বন্ধ করা হয়নি, কিন্তু আমার প্রবেশদার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যা হোক, আমি এ বিষয়ে তাকরীর করতে চাইনা।

প্রিয় মুসলমান ভায়েরা! এ পাকিস্তান সরকার প্রধান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে আহবান করে, আসুন! আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্থানের সমস্ত শহর বন্দরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করি, আবার সেই আমাকে করাচী ঢুকতে বাঁধা প্রদান করে, যাতে কখনও এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে না পারি। যা হোক এসব তাদের মরজী। এ নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। আজকের সভার আলোচনার পূর্বেই আমি আমার দলের জেনারেল মাওলানা আজম তারিক সাহেবকে আজকের ঐতিহাসিক সফলতার উপর মোবারকবাদ পেশ করছি। আল্লাহ তা'আলা এ মাহফিল কে কবুল করুন! ইহা আমাদের কোন কৃতিত্ব নয়, এ কামিয়াবী হক নেওয়াজের খুনের

বিনিময়ে হয়েছে যা এলাহাবাদে ঝরেছিল। এ সফলতা ঐ টগবগে রক্তের বিনিময়ে যা চৌদ্দশত বছরের প্রতিটি যুগেই ঝরেছে। আজ আমি সেই রক্তের কিছু সুগন্ধি দেয়ার চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ। সে টগবগে খুন দ্বারা আপনাদের হৃদয়কে সুগন্ধময় করব। সে খুনের সামান্য ইতিহাস আপনাদের দরবারে পেশ করব।

বন্ধুগণ! আপনারা জানেন, সে শোণিতের লালিমা কত জায়গায় বিস্তার লাভ করেছে। সেই খুনের নদী কোথায় কোথায় প্রবাহিত হয়েছে। কখনও সে খুন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জায়নামাজে প্রবাহের রাস্তা বানিয়েছে। কখনও কোরআনের পৃষ্ঠা গুলোকে রঙ্গীন করেছে, আবার কখনও সে রক্ত কারবালার প্রান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। কখনও সে খুন মিশরের জেলখানাকে রক্তাক্ত করেছে। আবার সে খুন ইবনে তাইমিয়ার আকৃতিতে কারাফটকে প্রবাহিত হয়েছে। কখনও সে খুন আবু হানিফা (রঃ) এর সেকেলে দুনিয়া কে লালবর্ণ করে দিয়েছে। কখনও সে খুন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ) এর শরীর থেকে বেত্রাঘাতের মাধ্যমে নির্গত হয়েছে। কখনও সে খুন ইবনে তাইমিয়া, ইমাম রাজি, ইমাম গাজালী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্, মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রঃ) এর আকৃতিতে প্রবাহিত হয়েছে।

এমনিভাবে প্রবাহমান রক্ত ধারা হযরত মাওলানা হক নেওয়াজ পর্যন্ত পৌঁছেছে। হক নেওয়াজের খুনের ছয়লাব শেমলীর বন্ধনে গিয়ে মিলিত হয়েছে। হক নেওয়াজের খুনের প্রবাহমান স্রোতকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য ইরান সহ সমগ্র পৃথিবী সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু হক নেওয়াজের শোণিতে এত তেজস্বতা, প্রখরতা ও উত্তপ্ততা ছিল যে, সমগ্র পৃথিবী মিলেও হক নেওয়াজের খুনের ধারা বন্ধ করতে পারেনি, বরং

তাঁর খুনের সাথে আরো অনেকের টগবগে রক্ত শামিল হয়েছে। হক নেওয়াজের রুহের সাথে বহু মুসলমানের রুহ একত্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রহমতে আমরাও ঐ খুনের বদলায় কিছু সামনে অগ্রসর হতে পারছি।

যা হোক আমি তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করি, আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতের সর্বোত্তম স্থান দান করুক!

আমার ভায়েরা! সময় বেশ হয়েছে, আপনারা তাকরীর শুনার জন্য অপেক্ষমান। এবার শুনুন, দুনিয়ার মানুষ কত ভাবে তাদের রক্ত প্রবাহ করছে, কেউ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে রক্ত প্রবাহ করছে। কারো খুন মুনাফেকীর জন্য ঝরেছে। কারো খুন বাক স্বাধীনতার জন্য প্রবাহিত হয়েছে। কারো খুন সাম্প্রদায়িকতায় ঝরেছে। কারো খুন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য প্রবাহিত হয়েছে। কারো খুন বেতন বৃদ্ধির জন্য ঝরেছে। কারো খুন নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু আজ আমি এমন লোকদের কথা আলোচনা করব, যাদের তাজা রক্ত মুহাম্মদে মোস্তফা (সাঃ) এর প্রিয় দ্বীনের জন্য ঝরেছে। যাদের খুন ইসলামের বড়ত্ব রক্ষার জন্য প্রবাহিত হয়েছে। তাদের খুন বন্দ্যা ছিলনা বরং চৌদ্দশত বৎসরের ইসলামী ইতিহাসের প্রতিযুগেই ঝরেছে। আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ ঐ খুন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সীমাহীন রক্ত ঝরিয়েছেন। আজ আমার গর্ব হচ্ছে যে আমার মুরব্বী হক নেওয়াজের রক্তও একই পথে ও একই চিন্তাধারায় প্রবাহিত হয়েছে। দুনিয়ার ধন সম্পদ, ক্ষমতা-নেতৃত্ব, এজেন্সি ইত্যাদির জন্য তাঁর রক্ত প্রবাহিত হয়নি।

আমার ভায়েরা! আমাদের অনেক সাথী শহীদ হয়ে গেছেন। আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার জন্য তাঁরা অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আমার কাছে এক লোক অতি আফসোসের সহিত বলতে ছিলেন যে আমাদের অনেক সাথী শহীদ হয়ে যাচ্ছে, আমি তাকে বলতে চাই, চিন্তার কারণ নেই। তারা তো দুনিয়ার জন্য প্রাণ দেয়নি, তাঁরা দ্বীনের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। তাঁরা যদি কোন নেতৃত্বের জন্য মারা যেত, তাহলে লোকজন তাদেরকে তিরস্কার করত। যদি কোন এজেন্সির জন্য জীবন দিত, তাহলে মানুষ তাদেরকে ভৎসনা করত। যদি ধন-সম্পদের লোভে প্রাণ দিত, তাহলে দুনিয়ার মানুষ তাদের শাহাদাতের ব্যাপারে সমালোচনা করত। এ সমস্ত মুমিনগণ এ জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছেন এবং কবর জগতে পা বাড়িয়েছেন, যাতে এ পথের পূর্বসূরী হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) কে কেউ গালি দেয়ার সাহস না পায়, হযরত আবুবকর (রাঃ) কে কেউ তার অকথ্য ভাষার পাত্র না বানায়। হযরত আলী ও উসমান (রাঃ) কে কেউ হেয় নজরে না দেখে।

আজ আমাদের গর্ব যে, ইসলাম নামের বৃক্ষটির গোড়ায় প্রতি যুগেই রক্ত ঝরেছে। বাতিলের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে আহলে হকদের খুন অবিরাম গতিতে ঝরছে। এ খুন অনেক নদী সাগরের পানিকে লালে লাল করে দিয়েছে। বাদশাহ আকবরের দ্বীনে এলাহীকে প্রতিহত করতে, মুজাদ্দেদে আলফে ছানীর লস্কর থেকে রক্ত ঝরেছে। উপমহাদেশে স্বাধীনতার সূর্য টিকিয়ে রাখতে টিপু সুলতান রক্তাক্ত হয়েছেন। ইংরেজদের অবৈধ দখলদারিত্ব বন্ধ করতে যেয়ে নিজের জান বাজী রেখে যুদ্ধ করেছেন নবাব সিরাজুদ্দৌলা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়েছেন সালাহুদ্দীন আয়্যুবী। রক্ত ঝরিয়েছেন নুরুদ্দীন জংগী। রক্ত

ঝরিয়েছেন ইবনে তাইমিয়া, আবু হানিফা, ইমাম গাজালী, ইমাম মালেক, ইমাম বোখারী, ইমাম নাসায়ী সহ অসংখ্য মহা মানব। মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর অসংখ্য সাহাবীর তাজা রক্ত এ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করে শত বার মর্মাহত হয়েছে।

হুজুর আকরাম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় দুইশত সাতাশি জন সাহাবীর খুন ঝরেছে। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর জীবদ্দশায় দুইশত সাতাশি জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। খিলাফতে রাশেদার যুগে সাতত্রিশ হাজার সাহাবীর রক্ত ঝরেছে।

বন্ধুগণ! ইসলাম ও দ্বীনের জন্য রক্ত প্রবাহিত করা গর্বের বিষয়, বীরত্বের পরিচয়। আমরা কাদের উত্তরসূরী? আমরা এমন সব মহামানবগণের উত্তরসূরী, যারা মুহাম্মদে মোস্তফা (সাঃ) এর হিফাজতের জন্য প্রাণ বিলীন করেছেন। নবী (সাঃ) এর চৌকিদারী করতে যেয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। আজ আমার দলের লোকেরা বলে থাকেন "হামারা নাম সিপাহী সাহাবা- হামারা কাম হিফাজতে সাহাবা"। আমাদের নাম সিপাহী সাহাবা এবং আমাদের কাজ সাহাবায়ে কিরামের সম্মান রক্ষা করা, তাদের শান বুলন্দ করা। সাহাবায়ে কিরামকে সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করা।

ভায়েরা আমার! সাহাবীগণের হিফাজত কেন করতে হবে? সাহাবীগণের ইজ্জত রক্ষা ও তাদের চৌকিদারী কেন করতে হবে? সাহাবীগণের গালমন্দ কারীদের বিষদাঁত কেন ভেঙ্গে দিতে হবে? এই জন্য, যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) নবী (সাঃ) এর চৌকিদারী করতেন, তাঁরা কামলিওয়ালার নওকরী করতেন, তাঁরা মুহাম্মদে মোস্তফা (সাঃ) এর জানের হিফাজত ও ইজ্জত রক্ষা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম

আল্লাহর দুশমনদের হাত থেকে কোরআন কে সংরক্ষণ করেছেন। খোদার বড়ত্ব ও শ্রেষ্টত্ব বর্ণনা করতেন। তাঁরা আল্লাহর একত্ববাদকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাহাবাগণ বাইতুল্লার সংরক্ষণ সহ মদিনার হুরমাতের অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন।

এখন যদি এ সমস্ত মহামানব নবী সহচরদের উপর কেউ কটুক্তি করে, তাঁর ময়লাযুক্ত অন্তরের ক্রোধানল সাহাবাদের উপর বর্ষণ করে, তাহলে আমার উপর ফরজ হবে যে, যেভাবে তাঁরা (সাহাবা কিরাম) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কদম মোবারকে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, তেমনি ভাবে আমার উপরও ফরজ হবে, আমি সাহাবায়ে কিরামের কদম মোবারকে প্রাণ উৎসর্গ করব। তাঁরা যেভাবে মুহাম্মদে মোস্তফা (সাঃ) এর নামে নিজেদেরকে বিলীয়ে দিয়েছেন, আমার উপর ও ফরজ হবে সাহাবীগণের নামে আমার জীবন বিলীয়ে দেয়া। যেভাবে তাঁরা নবী (সাঃ) এর ইজ্জত রক্ষার জন্য শহীদ হয়েছেন, আমার উপর কর্তব্য হবে, আমি যেন তাদের ইজ্জত রক্ষার জন্য শাহাদাত বরণ করি। যেভাবে তাঁরা হুজুর (সাঃ) এর সঙ্গীনী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর ইজ্জত রক্ষার জন্য জান কোরবান করেছেন, আমার উপর ও জরুরী হবে আমি হযরত আয়েশা (রাঃ) এর পাক দামানীর জন্য জান কোরবান করব। সাহাবায়ে কিরাম যেমনি ভাবে উত্তপ্ত বালুর উপর চামড়ার পিঠ লাগিয়ে মুহাম্মদে আরাবীর কালিমা বুলন্দ করেছেন, আমারও দায়িত্ব হলো জেলখানার কঠিন শাস্তি স্বাদরে গ্রহণ করা। সকল বাঁধা উপেক্ষা করে কালিমার আওয়াজ পৃথিবীতে বুলন্দ করা। যাঁরা জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে, যাঁরা ডেগের উত্তপ্ত টগবগে তেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পায়ে জিঞ্জির পড়ে ও হাতে বেড়ী লাগিয়ে আদরের সন্তান কে কোমল স্নেহ থেকে

বঞ্চিত করে, জীবন সঙ্গীনী স্ত্রীকে বিধবা করে, মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর গোলামী করে, নবী আরাবী (সাঃ) এর চৌকিদারী করে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন। আজ যদি আমাদের দেশে তাদেরকে কাফির বলা হয়, তাদের শানে গোস্তাখী করা হয়, তাহলে আমি তাদের তরে জীবন দিয়ে দিব, যেভাবে তাঁরা মুহাম্মদ (সাঃ) এর তরে কোরবান হয়েছেন। আজ আমি আমার শরীরকে রক্তাক্ত করে দিব, যেভাবে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্য স্বীয় শরীরকে তীরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন। আমার সন্তানকে ইয়াতিম করে দিব, যেভাবে তাঁরা নিজ সন্তানকে পিতৃহারা করে, নবী (সাঃ) এর ইজ্জত বুলন্দ করেছেন।

ভায়েরা আমার! আমি আপনাদের সামনে শোহাদায়ে কিরামের ইতিহাস তুলে ধরব। শহীদানদের খুনের সুভাস দ্বারা আপনাদের কে সুভাসিত করব। চৌদ্দশত বছরের ঐ রক্তাক্ত ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠা আপনাদের কাছে খুলে দিব। ইবনে হিশাম এবং তারিখুলবুগুল এর ঘটনাবলী স্পষ্ট ভাবে বয়ান করবো। কাদেসিয়া, জঙ্গে ইয়ারমুক, বদর, উহুদের সমস্ত শহীদের ইতিহাস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব ইন্‌শাআল্লাহ্। আমি বলব, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মুহাব্বতে কারা জান কোরবান করেছেন? বদর উহুদে কে কে শহীদ হয়েছেন? ছায়্যিদুশ্‌শূহাদা কোন যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন? কুস্‌তুন্‌তুনিয়া এলাকায় কারা অকাতরে জীবন বিলীয়ে দিয়েছেন? তাতারীদের দৃষ্টান্তমূলক মোকাবালা কারা করেছিলেন? ইসলামের শুরুলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত স্রোত বেগে শহীদের খুন বয়েই যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক শুস্ক জমিন শহীদের খুনের দ্বারা আদ্রতা পেয়েছে। মৃত্তিকা, তার গর্ভে শহীদানের রক্তাক্ত লাশ ধারণ করেই যাচ্ছে। টগবগে খুন বয়েই যাচ্ছে অবিরাম গতিতে। বিনিময়ে

ইসলামের ঝান্ডা উঁচু হয়ে আসছে। মুসলমান ভায়েরা! যে সকল মহামানবগণ তাজেদারে রিসালাতের জন্য জান কোরবান করেছেন, আজ তাদেরকে কাফির বলা হবে, আর আমি চুপটি করে থাকবো, তাদেরকে মুরতাদ বলা হবে আর আমি মুষ্টি বন্ধ করে রাখবো, এটা হতে পারে না, যখন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) কে মন্দ বলা হয়েছিল, তখনতো সাহাবায়ে কিরাম চুপ করে থাকেননি। যখন নবী আরাবী (সাঃ) কে হেয় প্রতিপন্ন করা হতো, তখন তাঁরা মুষ্টি বন্ধ করে রাখতেন না। যখন কামলিওয়ালা কে তীর মেরে নিঃশেষ করে দেয়ার চেষ্টা করত, তখন তাঁরা বৃষ্টির ন্যায় তীরের মাঝে কামলিওয়ালার ঢাল হয়ে যেতেন। উহুদের যুদ্ধে নবী (সাঃ) কে মাঝখানে বসিয়ে ১০/১২ জন সাহাবা সৈনিক চারপাশে দাঁড়িয়ে কাফেরদের দিকে বুক দিয়ে প্রাচীর সৃষ্টি করে ছিলেন, যাতে তীর বর্ষার শত আঘাত তাদের গায়ে লাগে। নবী (সাঃ) এর শরীরে কোন আচঁড় না কাটে। আজ সে সকল মহামানব কে মুনাফেক বলা হবে, আর আমি খামুশ থাকব, তাঁদের মহিলাদের কে ব্যভিচারীনী বলা হবে, আমি মুখ বন্ধ করে রাখব, তাদের স্ত্রীদের বদমাইশ বলা হবে আমি মুখে তালা দিয়ে রাখব, আমার অস্তিত্ব বাকী রাখব এটা কোন দিন হতে পারে না। যাঁরা স্বীয় জান মাল কোরবান করে গায়ের শক্তি অসার করে, মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর হিফাজত করেছিলেন, আজ তাদেরকে যদি কাফির বলা হয়, তাদের এহানত করা হয়, তাহলে তাঁদের ইজ্জত রক্ষার্থে আমার সর্বস্ব বিলীন করে দিব, প্রয়োজনে হাতকড়ি হস্তে ধারণ করব, পায়ে বেড়ী পড়ব, ফাঁসির রশ্মি স্বাদরে গ্রহণ করব, বুলেট ও গুলির প্রচন্ড আঘাত বুকে টেনে নিব, সন্তানের ভালবাসা, অর্ধাঙ্গীনীর মায়া-কান্না, পিতার পিতৃ স্নেহ, মাতার মাতৃস্নেহ, ভাই বোনের আদর সোহাগ পেছনে

ছুঁড়ে মেরে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করব, তবুও সাহাবাদের শানে এমন গোস্তাখী সহ্য করব না। আমার গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকবে, আর আবুবকর (রাঃ) কে গাল মন্দ করা হবে। আমার দেহে এক ফোটা খুন থাকবে আর বেলাল হাবশী কে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে, তা কখনও সহ্য করা হবে না। বন্ধুরা আমার! আপনাদের হয়ত জানা আছে, ইসলামের রক্তঝরা ইতিহাসে প্রথম শহীদ কে? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যুগের আখেরী শহীদকে? নবী (সাঃ) এর যুগে মোট কত জন শহীদ হয়েছেন? খিলাফতে রাশেদার যুগে মোট কত জন শহীদ হয়েছেন? যদি আপনারা মনযোগ সহকারে শ্রবন করেন, তাহলে সেই সোনালী ইতিহাস থেকে অজ্ঞতার পর্দা উঠিয়ে কিছু জ্ঞানের আলো ছড়াব। পুরুষদের মধ্যে হযরত যায়েদ বিন হালা (রাঃ) সর্ব প্রথম ইসলামে শাহাদাতের সিঁড়ি উন্মুক্ত করেন। যিনি হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রাঃ) এর প্রথম স্বামীর প্রথম ছেলে ছিলেন। যাকে খানায়ে কা'বার সামনে লোহার বর্যা দ্বারা আঘাত করে অভিশপ্ত আবুজাহল শহীদ করেছিল। নবী (সাঃ) এর জীবদ্দশায় সর্বশেষ শহীদ হযরত রাবিয়া (রাঃ)। মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম শহীদ সুমাইয়া (রাঃ)।

এখন ঐ সমস্ত শহীদানের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করব, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে শহীদ হয়েছেন। বদরের যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। খোমেনী তার কিতাব তাহরীরুর রাসায়েল এবং উছুলে কাফীতে লিখেছে যে, দেড় লাখ সাহাবীর মধ্যে মাত্র চারজন ব্যতীত কারো অন্তরে ঈমান ছিলনা। হুজুর (সাঃ) ইন্তেকালের পর সকলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। উক্ত চারজন হলেন (১) হযরত মেকদাদ (রাঃ) (২) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) (৩) আবুযর গিফারী (রাঃ) (৪)

হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)। এই চারজন মুসলমান ছিলেন, বাকী সকলে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ্)।

আমি খোমেনীর বিকৃত লেখার উপরে প্রশ্ন উত্থাপন করি যে, যদি শুধু চারজন সাহাবী মুসলমান হয়ে থাকেন আর বাকী সব মুরতাদ হয়ে থাকেন, যাদের মধ্যে বিন্দু মাত্র ঈমান ছিলনা, তাহলে বলতে হবে যে, বদরের ময়দানে যে চৌদ্দজন সাহাবী নবী (সাঃ) এর আশে পাশে শহীদ হয়েছেন, তাঁরা ঈমান ছাড়া শহীদ হয়েছেন? বদরের ময়দানে দুইজন ছোট বাচ্চা ও শাহাদাত বরণ করেছেন। উহুদের পাহাড়ে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন, যাদের মধ্যে হযরত হামজা (রাঃ) ও ছিলেন। যাকে নবী মোস্তফা (সাঃ) সাইয়্যিদুশ্শুহাদা উপাধিতে ভুষিত করেছেন। উহুদ যুদ্ধে হানজালা (রাঃ) ও শহীদ হয়েছেন। যার গোসল আরশে মহল্লায় মা'সুম ফেরেস্তারা দিয়েছিলেন। স্ত্রীর সাথে আনন্দঘন মুহুর্তেও যিনি কামলিওয়ালার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে তেরজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। হুনাইনের ময়দানে সতেরজন সাহাবী আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন'। খাইবর যুদ্ধে উনিশজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। বিরে মাউনায় ৬৮ জন সাহাবা সৈনিক শহীদ হয়েছেন। বনু লিহয়ানের কবিলায় দশজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। তবুকের যুদ্ধে ছয়জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন এবং বিভিন্ন ভাবে আরো সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে সর্বমোট ২৮৭ জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য হতে হযরত আবুবকর (রাঃ) এর যুগে আড়াই হাজার সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। ফারুকে আজমের যুগে চৌদ্দ হাজার সাহাবী শহীদ হয়েছেন। উসমান গনী (রাঃ) এর খিলাফত কালে ষোল হাজার সাহাবী শহীদ

হয়েছেন। তারপর জংগে সিফফিন ও জংগে জামাল এ অনেক সাহাবায়ে কিরাম শহীদ হয়েছেন। সে যুদ্ধে অনেক সাহাবী ছিলেন এবং অনেক তাবেয়ী ও ছিলেন। ইসলামের ইতিহাস শহীদের টগবগে খুনের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু মুসলমান আজ তাঁদের উজ্জ্বল ইতিহাস ভুলে বসেছে। আফসোসের বিষয়! যখন কালের চাকা ঘুরে হজ্বের মাস শেষ হয়ে মহররম মাস আসে, তখন শিয়া, সুন্নী মুসলমান সকলেই বলে, এই পবিত্র মাসে হযরত হুসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। যিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। যে শহীদের কাছে তিন দিন পানি বন্ধ ছিল, সে শহীদের কথা শুধু তোমাদের স্মরণ আছে আর যে শহীদের কাছে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানি পৌঁছেনি, চল্লিশ দিন যাবৎ যিনি পানির অভাবে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন সেই শহীদের কথা তোমাদের স্মরণ নেই। সেই শহীদের কথা তোমরা কেমনে ভুলে গেলে? ঐতিহাসিক কারবালা প্রান্তরে যিনি শাহাদাত লাভ করেছেন তার কথাই তোমরা বারবার মনে করে থাক। কিন্তু যিনি মদিনায় শাহাদাত লাভ করেছেন। শুধু মদিনায় নয় বরং নবীর মসজিদে, পয়গাম্বরের মেহরাবে, কামলিওয়ালার মোসল্লায়, ফজরের নামাজরত অবস্থায় শহীদ হয়েছেন। যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন পয়গাম্বরের ঐ রক্তাক্ত মোসাল্লা আল্লাহর আদালতে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার রাসূল (সাঃ) এর সিজদার সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং ফারুকে আজমের খুনের ও সাক্ষ্য দিচ্ছি। মুসলমান ভায়েরা! মহররম মাস আসছে, শহরের সর্বত্র গরম হতে যাচ্ছে পুলিশ তুমুল লড়ায়ের কল্পনা করে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। মৌলভী ও পীর সাহেবগণও পেরেশান হয়ে গেছেন। কেন এ পেরেশানী? যেহেতু নবী (সাঃ) এর দৌহিত্র এ মুহররম মাসে শহীদ হয়েছেন, এজন্য পেরেশান।

চৌদ্দশত বছর পূর্বের মর্মান্তিক ঘটনার উপর পেরেশান। এ দিনে রাসূল (সাঃ) এর নাতী হুসাইন (রাঃ) শহীদ হয়েছেন, এজন্য এত পেরেশান। মহররমের নবম ও দশম তারিখ সরকারী ছুটির দিন। পাকিস্থানের এক গভর্ণর জেনারেল মির্জা সিকান্দর ছিলো শিয়া পন্থী, সে এই দুই দিনকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষনা করেছে। তারপর চুয়াল্লিশ বছর যাবৎ এ পাকিস্তানে এমন কোন সুন্নী গভর্ণর আসেনি, যার একথা জানা আছে যে, ফারুকে আজম ও শহীদ হয়েছিলেন। শহীদ শুধু হুসাইন (রাঃ) হয়নি, এর চেয়েও মর্মান্তিক ভাবে শাহাদাত লাভ করেছেন অনেক সাহাবা সৈনিক। হযরত উসমান গনী (রাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত আলী মুর্তোজা (রাঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট আকাবির সাহাবীগণ ও শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আফসোস! তাঁরা কি মুসলমান ছিলেন না? কিসের অভাব ছিল হযরত ফারুকে আজমের মধ্যে ও সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর মধ্যে? কি ত্রুটি ছিল হযরত আলী ও উসমান গনী (রাঃ) এর মধ্যে। তাদের শাহাদাতের কাহিনী কেন টিভির মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় না। তাঁরা কি অপরাধ করেছে? আসলে এই সকল ক্ষমতা বাহী শাসকরা ইসলামের নাম জপে রাফেজিয়্যাত, শিয়ায়িয়্যাতের চরিত্র ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রোতা বন্ধুরা! আজ আমরা মুসলমানের সুপ্ত হৃদয়ে এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চাই যে, ইসলাম নামক বিশাল বৃক্ষের গোড়ায় শুধু একজন শহীদের খুন ঝরেনি, বরং ইসলামের সকল শাখা প্রশাখা গুলোতে বহু শহীদের খুন ঝরেছে। যার ফলে ইসলাম নামক বৃক্ষ সতেজ রয়েছে। আমার কাছে এমন শহীদের ঠিকানা রয়েছে যে, সে যে দিন আল্লাহর রাহে কাজ শুধু করেছে সে

দিনই আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে শহীদ হয়ে কোরবানী করার ও জীবন উৎসর্গ করার ছবক দিয়ে গেছেন।

হে মুসলমান বন্ধুরা! তোমরা ঐ শহীদের কথা কেন ভুলে গিয়েছ? যিনি উহুদ পাহাড়ের নীচে তড়পাতে ছিলেন। যার লাশের স্পন্দন জমিন সহ্য করতে পারছিল না। তিনি নবী মোস্তফা (সাঃ) এর খুব ঘনিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁর লাশের উপর আলমে বরযখের পোযাক, কাফনের কাপড় রাখা হলে কাপড়ের স্বল্পতার দরুণ পুরো লাশ ঢাকা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সংবাদ পেয়ে হুজুর (সাঃ) এর আখিদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! কাপড়ের স্বল্পতার দরুণ পুরো লাশ ঢাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর অবয়ব লম্বা আকৃতির ছিল, হুজুর (সাঃ) কেঁদে কেঁদে বললেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি মুসলমান হওয়ার পুর্বে দিনে দুই সিট করে জামা পড়তেন। মুসলমান হয়ে কালেমা তায়্যিবাহ পড়ার পর আজ তার কাফনের পূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে না। নবী (সাঃ) ফাইসালা দিলেন যে, তার চেহারার উপর কাপড় দিয়ে দাও। পায়ের অংশে ঘাস দিয়ে ঢেকে দাও। কিয়ামতের দিবসে এ ঘাস আল্লাহর দরবারে তাঁর শাহাদাতের সাক্ষ্য দিবে যে আমার কাছে শহীদ আছে। শহীদের খুন আছে। খুনের অসংখ্য ফোঁটা আছে। শহীদের লাশ আছে। ওহে মুসলমান! তোমরা ঐ শহীদের ইতিহাস কিভাবে ভুলে গিয়েছ? যার কবর দেয়া হয়েছে উহুদ পর্বতে। নাম তাঁর হামজা (রাঃ)। যিনি হুজুর (সাঃ) এর আপন চাচা ছিলেন। নবী আরাবী (সাঃ) এর পবিত্র যবান দ্বারা যার উপাধি হয়েছে সায়্যেদুশ্শুহাদা। তাঁর সাড়ে তিনহাত দেহের বারটি টুকরা উহুদ পাহাড়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ছিল। হুজুর (সাঃ) লাশের কাছে আসলেন। মনের অজান্তেই অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। হুজুর (সাঃ)

বললেন, হে আল্লাহ! আমার এই চাচাজানের উপর আমি সন্তুষ্ট, তুমিও সন্তুষ্ট হয়ে যাও। নবী করীম (সাঃ) ফরমালেন, আমার ফুফু ছফিয়্যাহ কে সংবাদ দাও। তিনি যেন তাঁর ভায়ের লাশের কাছে আসে। খোদার কসম! কোন বোন তাঁর ভায়ের লাশের এরূপ ছিন্নভিন্ন টুকরার কাছে এসে স্থির থাকতে পারবে না। আহ! কি হিংস্রতায় ভরপুর কাফেরদের হৃদয়। শরীরের গোস্ত এমন ভাবে টুকরা টুকরা করা হয়েছিল, যেমনভাবে কসাই বকরীকে করে থাকে। হযরত হামজা (রাঃ) এর চক্ষুদ্বয় উপড়ে ফেলা হয়েছিল। হাত দুটো ছিল দেহ থেকে আলাদা। কদম মোবারকদ্বয় কে দেহের সাথে মিলিত পাওয়া যায়নি। তাঁর কলিজাকে ঝাঁঝঁরা করে দিয়ে ছিল ঐ পাষন্ডরা। পড়ে আছে অন্য স্থানে। মানুষ বলে চেনা যায় না তাকে। হুজুর আকরাম (সাঃ) বললেন, আমার চাচাজানের টুকরো গুলো একটি কাপড়ে একত্রিত করো! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ে ছিলেন। অশ্রু ঝড়ালেন। কিন্তু সফিয়্যাহ (রাঃ) এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। বরং ভায়ের শাহাদাতে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। হে মুসলমান ভায়েরা। পয়গাম্বরের ছোট ফুফু নিজের সহোদর ভায়ের লাশের টুকরা দেখেও হায়হুতাশ করেননি, ভেঙ্গে পরেননি। ধৈর্য্য ধারণ করে এ কথারই সবক দিলেন, যে আমার এরকম শত ভাই শহীদ হতে পারে, রক্তের বন্যা বয়ে যেতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদে মোস্তফা (সাঃ) ও ইসলামের সামান্য ক্ষতি ও সহ্য করা যাবে না। বরদাশত করা হবে না। মুহাম্মদে আরাবী ও ইসলামের উপর চরম আঘাত আসা সত্ত্বেও যাদের অন্তরে প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহা জাগে না। লক্ষ লক্ষ মুসলমান কাফের বেদ্বীনদের হাতে নির্মম ভাবে শহীদ হওয়া সত্ত্বেও যাদের অস্ত্র হাতে নিতে মন চায় না,

তাঁরা কিসের মুসলমান?। তাদের ঈমানে অবশ্যই দুর্বলতা রয়েছে। এটা আমার কথা নয়। রাসুল (সাঃ) নিজেই একথা বলেছেন।

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ স্বশস্ত্র জিহাদ করলো না বা স্বশস্ত্র জিহাদের নিয়ত ও করলো না, তারা অন্তরে নেফাক নিয়ে মৃত্যু বরণ করলো।

বন্ধুরা আমার! উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা হয়েছে। সকলেই উহুদ প্রান্তরে চলছে। একজন সাহাবী বিবির কাছে রাত্রি-যাপন করেন। তিনি নতুন বিবাহ করার কারণে রয়ে গেছেন। বাসর রাত্রি কেটে ভোর হতে লাগল। ফজরের নামাজের পূর্বে গোসলের জন্য হাম্মাম খানায় প্রবেশ করলেন। গোসল ফরজ হয়েছে। আকস্মিক যুদ্ধের দামামা বেঁজে উঠল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এক সংবাদদাতা সজোরে আওয়াজ দিচ্ছিল, হে মদিনা বাসী! উঠো, জাগো! উহুদ প্রান্তরে, সত্য-মিথ্যা, হক-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই শুরু হয়েছে। নবী (সাঃ) এর হুকুম হাম্মাম খানার লোকটির কর্ণ কুহুরে পৌঁছে গেল। গোসলের আর সুযোগ হলনা। দ্রুত বেরিয়ে আসলেন হাম্মাম খানা হতে। স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, গোসল করেননি কেন? উত্তরে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মধুর বাণী কানে পৌঁছেছে। জিহাদের ডাক এসেছে। আর বসে থাকতে পারি না। জিহাদের পথ রক্তে রাঙা। সেই রক্তে গোসল করতে চাই। এখন গোসল করলে বিলম্ব হয়ে যাবে। উহুদ যুদ্ধে যাচ্ছি, এই বলে জীবন সঙ্গীনীর কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং বললেন "ওহে জীবন সঙ্গীনী! জান্নাতের খুশবু পাইতেছি, হয়ত আজই শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে যাবো"। স্ত্রী খুশি মনে বিদায় দিলেন। আজকালকার মহিলা হলে স্বামীর দামান ধরে

চিৎকার করে বলত, আমাকে কার পাহারায় রেখে যাচ্ছেন? কিন্তু স্ত্রী-তিনিও তো কামলিওয়ালার সাহাবীয়া ছিলেন। স্বামী স্ত্রীকে সম্বোধন করে শেষ কথা বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইজ্জতের জন্য, তাঁর হিফাজতের জন্য সর্বস্ব বিলীয়ে দিবো! যদি আমি গাজী হয়ে ফিরে আসি, তাহলে দু'বার মোলাকাত হবে। অন্যথায় হাউজে কাউছারে সাক্ষাৎ হবে। মুসলমান ভায়েরা আমার! সেই সাহাবী চলে গেলেন রণক্ষেত্রে। তুমুল লড়াই চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহর কিছু দুশমনকে কতল করে দিলেন। অবশেষে নিজেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। কাফির বাহিনী পালিয়ে ময়দান ত্যাগ করলো। যুদ্ধ আস্তে আস্তে শেষ হল। নবী করিম (সাঃ) সত্তরজন শহীদের মোবারক লাশ একত্রিত করলেন কিন্তু হানজালা (রাঃ) এর লাশ পাওয়া গেল না। তাঁর লাশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নজরে পড়ছে না। হুজুর (সাঃ) পেরেশান হয়ে গেলেন। গেল কোথায় তার লাশ! কাফির বাহিনী কি তাঁর লাশ নিয়ে গেছে ? অনেক কথাই রাসূল (সাঃ) এর মনে জমা হলো। এসব ভাবতে ভাবতেই আকাশ থেকে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি পেরেশান কেন ? চিন্তিত কেন ? শহীদের ব্যাপারে মাসআলা হল, গোসল ব্যতীত রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করতে হবে। কিন্তু শহীদ হানজালার উপর জানাবাতের কারণে গোসল ওয়াজিব ছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন, হে জিবরাইল ! যাও হানজালার লাশ আকাশে উঠিয়ে নিয়ে এসো। তাঁর গোসলের ব্যবস্থা আকাশে হবে। তাই হচ্ছে। হে নবী ! আকাশের সত্তর হাজার ফেরেশতা স্বর্ণ-রোপ্যের পাত্রে হানজালার গোসল দিতেছেন। কিছুক্ষণ পরেই গোসল সেরে ফেরেস্তাগণ হানজালা (রাঃ) এর লাশ কামলিওয়ালার কাছে

ফিরিয়ে দিলেন। এখন ও গায়ের পানি শুকাইনি। ঝর ঝর করে পানির ফোঁটা শরীর থেকে জমিনে পড়ছে।

খোমেনী বলেছে, তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। যাদের মৃত্যুতে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) কেঁদেছেন, যার গোসল আকাশে হয়েছিল, যার গোসল ফেরেশতারা দিয়েছেন তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না ? যাদের গোসল স্বয়ং কামলিওয়ালার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের ভিতরে ঈমান ছিল না। যাদের জানাজার নামাজ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পড়িয়েছেন তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। খোমেনীর এ সব কটুক্তি শুনে শরীর শিহরিয়ে উঠে।

যখন জংগে মুতায় হযরত জাফর (রাঃ) এর হাতে ঝান্ডা এলো, জাফর (রাঃ) পতাকা হাতে নিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। নিজের ঘোড়ার পা নিজেই কেঁটে দিলেন। যেন পালাবার সুযোগ না থাকে। তারপর কয়েকটি কবিতা আবৃতি করলেন, যার অর্থ হলো এই, হে লোক সকল! জান্নাত কতইনা সুন্দর! জান্নাতের নিকটবর্তী হওয়া কতইনা উত্তম, জান্নাতের পানি কতইনা ঠান্ডা! রোম বাসীদের শাস্তি ভোগ করার সময় এসেছে, আর সে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব আমাকেই দেয়া হয়েছে। কবিতা পড়তে পড়তে তরবারী হাতে অগণিত কাফির সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেনাপতি হিসাবে তাঁর হাতেই ঝান্ডা ছিল, কাফিররা তাঁর ডান হাত কেঁটে দিল। ততক্ষণাৎ বাম হাতে ঝান্ডা নিলেন। কাফেররা তাঁর বাম হাতও কেঁটে দিল। তখন উভয় বাহুমূল দ্বারা পতাকা বুকে চেঁপে ধরলেন, রোম সেনারা তাঁর পা দুটি কেঁটে ফেলল, তিনি মুখের দ্বারা পতাকা কামড়ে ধরলেন। এমতাবস্থায় পশ্চাৎদিক হতে এক শত্রু শয়তানের চরম আঘাতে তাঁর দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, যুদ্ধের পর আমরা তাঁর শরীরের শুধু সম্মুখ ভাগেই নব্বইটি যখম দেখেছি। যখন জাফর (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন, হযরত জাফর (রাঃ) এর হাত কেঁটে গেছে, পা কেঁটে গেছে। হযরত জাফরের গরদান উড়ে গেছে। মোট কথা হযরত জাফর (রাঃ) অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবে শহীদ হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কান্না সংবরণ করতে পারলেন না। অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল রাসূল (সাঃ) এর আঁখি দুটি। হুজুর (সাঃ) কেঁদে কেঁদে হযরত জাফর (রাঃ) এর বাড়ীতে গেলেন, হযরত জাফর (রাঃ) এর কচিকাঁচা বাচ্চাদের উপর নবুওয়াতওয়ালা হাত বুলিয়ে শান্তনা দিলেন এবং বললেন, হে জাফরের সন্তানেরা! আজ তোমাদের বাবা শাহাদাতের বিনিময়ে জান্নাতে চলে গেছেন। দুঃখ করো না! আজ থেকে আমি মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের বাবা হয়ে তোমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবো। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হবেন তোমাদের মাতা। তিনি তোমাদের মাতৃস্নেহে স্নেহ দিবেন।

মুসলমান ভায়েরা! যাদের শাহাদাতে নবী করীম (সাঃ) কেঁদেছেন। কুখ্যাত খোমেনী বলে, তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, তাদের অন্তরে দ্বীন ছিল না, রাসূল (সাঃ) এর মুহাব্বত ছিল না। তাদের হৃদয়ে রাসুলের ভালবাসা ছিল না। খোমেনীর এ সব নাপাক বক্তব্য অসহ্যকর। আমরা কখনো এসব উক্তি শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। সাহাবায়ে কিরাম যদি দ্বীন ইসলামের জন্য, নবী (সাঃ) এর জন্য জান-মাল বিসর্জন দিতে পারেন, আমরাও এ দ্বীনের জন্যে, সাহাবায়ে কিরামের মান-সম্মান সমুন্নত রাখার জন্যে, জান-মাল সব কিছু কোরবান করে দিব।

বন্ধুরা আমার! একজন সাহাবী রাতের গভীরে মসজিদে নব্বীর দরজায় বসে আছেন। পড়নে এক টুকরো জীর্ণশীর্ণ কাপড়। ছতর ঢাকার কাপড়টুকু ব্যতীত আর কোন কাপড় তাঁর গায়ে নেই। এদিকে হাড় কাঁপানো শীত। ইত্যবসরে হুজুর (সাঃ) মসজিদে এসে জিজ্ঞেস করলেন, দরজায় কে? উত্তর এলো, আমার নাম আব্দুল্লাহ্। যে নাম আপনিই রেখেছেন। আমি কিছুদিন পূর্বে আপনার হাতে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আজ আমার আব্বা আমার শরীর থেকে কাপড় খুলে নিয়েছেন। আমাকে বস্ত্রহীন করে নানা রকম অত্যাচার করেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এই হল আমার অপরাধ। হুজুর (সাঃ) সাথে সাথে তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নবুওয়াতওয়ালা হাতে দুটি চাদর তাকে দিয়ে বললেন, ইহা দ্বারা শরীর ঢেকে নাও। আরবী ভাষায় যার দুটি চাদর আছে তাকে জুলবাগাদাইন বলা হয়। অর্থাৎ দুই চাদরওয়ালা। আব্দুল্লাহ নবী আরাবী (সাঃ) এর ঘরে প্রবেশ করেই বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার জন্য দু'আ করুন! আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের মৃত্যু দান করেন। হুজুর (সাঃ) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আব্দুল্লাহ্ কে শাহাদাতের অমূল্য সম্পদ দান করুন। দ'দিন না যেতেই তবুক যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। হুজুর (সাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহ জলদি প্রস্তুতি নাও, এসে গেছে তোমার কাংখিত বাসনা পূর্ণ হওয়ার সময়। আব্দুল্লাহ খুশিতে আত্মহারা, শাহাদাতের প্রবল তামান্না তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে প্রতিটি মুহূর্তে। শাহাদাতের অধীর আগ্রহ তাকে নাচিয়ে তুলছে। অবশেযে সমরসাজে রণক্ষেত্রের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) রাসূল (সাঃ) এর দশ হাজার সাহাবা সৈনিকের সাথে পা বাড়ালেন। জিহাদের কাফেলা

ছুটে চলছে তবুক পানে। পথিমধ্যে কোন এক স্থানে পৌঁছে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত হলো। রাত্রি কেঁটে গেল, ভোরের আলো আলোকময় করলো পৃথিবীকে। কিন্তু আব্দুল্লাহ (রাঃ) আর জীবিত পাওয়া গেল না। আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর বাসনা পূর্ণ করেছেন। পয়গাম্বর (সাঃ) যখন জানতে পারলেন, যে আব্দুল্লাহ্ জুলবাগাদাইন শহীদ হয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছেন। তিনি বললেন ওহে আমার সাহাবীরা! আব্দুল্লাহ জুলবাগাদাইনের জন্য আমার বড় দুঃখ হয়! আমি তাঁর পিতা সম্পর্কে জানি, তাঁর পিতা আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী লোক। তাঁর ঘর সম্পর্কেও আমার জানা আছে। তাঁর ঘরে সব জিনিযের প্রাচুর্যতা আছে কিন্তু একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতে দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করার কারণে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গ দেয়ার কারণেই তাঁর এ করুণ অবস্থা হয়েছিল। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাকে বিবস্ত্র হতে হয়েছে, ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে। হে আল্লাহ! আমি আব্দুল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হুজুর (সাঃ) সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন যে যখন আব্দুল্লাহর কাফন দাফনের সময় হয়, তখন আমাকে জানাবে। আমি নিজেই তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন করব। আমি তাঁর জানাজার নামাজ পড়াবো। সব কাজ শেষ হয়ে দাফনের সময় এলো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং কবরে নেমে লাশের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের ভায়ের লাশ আমার হাতে দাও! যখন আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর লাশ সরওয়ারে কায়েনাতের হাতে রাখা হলো, তখন সকল সাহাবায়ে কিরাম চিৎকার দিয়ে উঠলেন। কি সৌভাগ্য আব্দুল্লাহর! হযরত সা'আদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কান্না বিজড়িত কণ্ঠে চিৎকার

করে বলে উঠলেন, হায় আফসোস! আজ যদি আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর স্থলে আমার লাশ হতো। তাহলে কতইনা ভাল হতো! আমাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) নবুওয়াতওয়ালা হাতে কবরে রাখতেন।

বন্ধুগণ! ইসলামের ইতিহাস, ইহা শহীদের ইতিহাস। সে ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় রয়েছে কোন না কোন শহীদের শাহাদাতের হৃদয় বিদারক কাহিনী। সে সকল শোহাদায়ে কিরাম বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাথে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে ছিলেন। রাসূল (সাঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, রাসূল (সাঃ) এর মুহাব্বতে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। পয়গাম্বর (সাঃ) এর ইশকে নিজেকে আত্মোৎস্বর্গ করেছেন।

ভায়েরা আমার! ঈমানের পথ রক্তে রাঙা। ঈমানের পথে সাহাবায়ে কিরাম সেই পরীক্ষায় পাস করেছেন। শহীদগণও সেই পরীক্ষায় পাস করেছেন। আমাদেরও সেই পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

বন্ধুগণ! বনু লিহ্‌য়ান কবিলায় দশজন মর্দে মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন। যাদের কমান্ডার ছিলেন হযরত আছেম বিন ছাবেদ আনছারী (রাঃ)। বিস্তারিত ঘটনা বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে। হুজুর (সাঃ) আছেম বিন ছাবেত (রাঃ) কে নয়জন সাহাবী সাথে দিয়ে লিহ্‌য়ান কবিলার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠালেন। পথিমধ্যে কোন এক পাহাড়ে তাদেরকে কাফিররা ঘিরে ফেলল। কাফিররা বলল, হাতিয়ার ফেলে দাও! আত্মসমর্পন কর! বেঁচে যাবে। মুক্তি পেয়ে যাবে। হযরত আছেম বিন ছাবেত (রাঃ) বললেন, আমরা মুজাহিদে আজম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর সৈনিক। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আদর্শে অনুপ্রাণিত বীর সেনানী মোরা মাথা নত করতে জানি না। জান দিতে পারি। শাহাদাত বরণ করতে পারি। সর্বস্ব বিলীন করতে জানি, কিন্তু

নবী (সাঃ) এর দেয়া হাতিয়ার ফেলতে পারিনা। আত্মসমর্পন করবো না। আমরা মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী। ভয় নেই মোদের দুনিয়ার জগতে। খোদার দুশমনরা অগ্নিশর্মা হয়ে সে পাহাড়েই সাতজন সাহাবীকে শহীদ করে ফেলল। বাকী তিনজন জীবিতবস্থায় গ্রেফতার হলেন। (১) আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক (রাঃ) (২) হযরত খোবায়েব (রাঃ) (৩) হযরত যায়েদ (রাঃ)। কাফিররা তাদেরকে গ্রেফতার করে হাতকড়া পড়িয়ে মক্কার দিকে রওয়ানা হল। পথিমধ্যে আব্দুল্লাহ্ বিন তারেক (রাঃ) কে শহীদ করে দেয়া হল। যায়েদ ও খোবায়েব (রাঃ) কে বনু লিহ্য়ানের সরদার উকবা বিন আমের এর সামনে পেশ করা হল। তখন উকবা বিন আমের খোবায়েব (রাঃ) কে ক্রয় করলো তার পিতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। কেননা খোবায়েব (রাঃ) উকবা ইবনে আমেরের পিতাকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন আর যায়েদ (রাঃ) কে সফওয়ান বিন উমাইয়্যা ক্রয় করলো তার পিতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে। সফওয়ানের পিতা ও বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। উকবা তাদেরকে মক্কা নিয়ে গেল। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল উকবার কুফুরী ভরা অন্তরে। এবারই উত্তম সুযোগ বাপের প্রতিশোধ গ্রহণের। হত্যার বদলায় হত্যা। মক্কায় নিয়ে সফওয়ান হযরত যায়েদ (রাঃ) কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। ফাঁসির রশ্মি গলায় কসছে, এমতাবস্থায় সফওয়ানের লোকেরা হযরত যায়েদকে বললো! হে যায়েদ! তুমি এই কথাটুকু মেনে নাও যে, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তোমার স্থানে তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ফাঁসি দেয়া হোক? তুমি যদি এ কথাটুকু মেনে নাও, তাহলে আমরা তোমাকে মুক্তি দিয়ে দিবো। যায়েদ (রাঃ) বজ্র কণ্ঠে বললেন, আমি খতম হতে পারি, আমার দেহ ছিন্নভিন্ন হতে পারে,

ফাঁসিতে ঝুলতে প্রস্তুত আছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কদম মোবারকে একটা কাঁটার আঘাতও সহ্য করবো না। মুহাম্মদ (সাঃ) এর সামান্য কষ্টের কল্পনাও বরদাশত করবো না।

ওরে মুসলমান ভায়েরা! একটু চিন্তা করে দেখুন! তাঁরা দ্বীনের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন, মুহাম্মদে আরাবী (সাঃ) এর জন্য কেমনে হাসি মুখে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলেছেন। আর আমরা কি করছি? আজ মহানবী (সাঃ) কে গালি দেয়া হচ্ছে, অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা নবী (সাঃ) কে শুকরের সাথে তুলনা করছে, নবী (সাঃ) কে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে। ইতর বলা হচ্ছে। নবী (সাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় কোরআন ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করছে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে কোরআন ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। আজ কোরআন বাথরুমে পাওয়া যাচ্ছে। কাদিয়ানীরা নবী (সাঃ) কে অস্বীকার করছে। ওরা নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধে বই ছাঁপিয়ে প্রকাশ্যে বিলি করছে।

বন্ধুরা আমার! তরুণ ভায়েরা আমার! উঠ! জাগো! রুখ! অস্ত্র হাতে নাও। ঝাঁঝরা করে দাও নবী বিদ্বেষীদের বুক। গুড়িয়ে দাও কাদিয়ানীদের আস্তানা। উড়িয়ে দাও ভন্ডপীরদের ঠিকানা। ভস্ম করে দাও কোরআন অবমাননাকারীদের মস্তক। নামধারী মুসলমান মুনাফেকদের জীবিত থাকতে দিও না। তাদের খতম করে মুসলমানের দেশ পরিষ্কার কর। নবী (সাঃ) এর দিল ঠান্ডা কর। ফতুয়া তালাশ করিও না। সব কাজ ফতুয়ার পিছনে পড়ে হয় না। পীর সাহেবগণের অনুমতি নিতে হয় না। খোদ আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে ওদের কে খতম করতে বলেছেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক ওদের কে খতম করার ফতুয়া দিয়েছেন। নামায হলো ফরজ ইবাদত, ইহা আদায় করতে পীর

সাহেবগণের অনুমতির দরকার হয় না। এমনি ভাবে নবী (সাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণকারীদের শাস্তি দেয়া ও ফরজ ইবাদত, ইহা আদায় করতেও পীর সাহেবীগণের অনুমতি লাগবে না।

বন্ধুরা আমার! আবুবসীর (রাঃ) মুসলমান হয়ে মক্কা হতে মদিনায় পৌঁছলেন, এ সময় মক্কার কাফিরদের সাথে নবী (সাঃ) এর স্বন্ধি ছিল। স্বন্ধির শর্তের মধ্যে একটা অন্যতম শর্ত ছিল যে, মক্কার কোন লোক মুসলমান হয়ে মদিনায় গেলে, মুসলমানগণ তাকে মক্কার কাফিরদের হাতে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখিত শর্ত মোতাবেক মক্কার একটি প্রতিনিধিদল মদিনায় পৌঁছলে, নবী (সাঃ) তাকে প্রতিনিধিদলের হাতে হস্তান্তর করেন। প্রতিনিধিদল তাকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলো, এ সময় আবুবসীর (রাঃ) তাদের তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে একজন কে হত্যা করলেন, আর অপরজনকে আহত করে নবী (সাঃ) এর দরবারে ফের উপস্থিত হলেন। শর্ত ভঙ্গের কারণে নবী (সাঃ) তাকে কিছুই বলেননি। দূত হত্যার কারণে ও নবী (সাঃ) তাকে কোন শাস্তি দেননি। বরং যখন মক্কার লোকেরা পুনঃবার নবী (সাঃ) এর কাছে এলো, এবং আবুবসীরকে তাদের হাতে তুলে দেয়ার আবেদন জানালো, তখন নবী (সাঃ) আবু বসীর (রাঃ) কে লক্ষ করে বললেন, হায় আফসোস! তোমার যদি কোন সাহায্যকারী হতো! একথা শুনে আবুবসীর (রাঃ) বুঝতে পারলেন, আমাকে নবী (সাঃ) পুনরায় কাফির বাহিনীর হাতে হস্তান্তর করবেন। তাই তিনি কাল বিলম্ব না করে, মদিনা হতে পালিয়ে সমুদ্র উপকুলের পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় নিলেন। এ সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়লে, মক্কা হতে আবুজান্দাল (রাঃ) সহ আরও কিছু অসহায় মুসলমান আবুবসীর (রাঃ) এর সহিত মিলিত হলেন। সমুদ্র

উপকূল ছিল দূর্গম পাহাড়ী এলাকা, যেখানে কোন জনবসতি ছিল না। এমন নির্জন স্থানে এ সকল অসহায় মুসলমান ভীষণ খাদ্য কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। তাঁরা মক্কা হতেও খাদ্য যোগাড় করতে পারতেন না, যেহেতু মক্কাবাসী হলো তাদের জানের চরম শত্রু। আর মদিনা হতেও খাদ্য নেয়া সম্ভব ছিলনা, যেহেতু মদিনার মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীর চুক্তি রয়েছে। আর মদিনার সাথে যোগাযোগ করাও কষ্টের ব্যাপার। অনাহারে অর্ধাহারে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েন কিন্তু কাফিরদের কাছে মাথা নত করেননি। দ্বীনের উপর অটল ছিলেন। এ সময় তাঁরা ফতুয়া তালাশ করেননি, যে আমরা এ কষ্টের চেয়ে মক্কায় বিবি বাচ্চা নিয়ে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করি এবং নিজের ঈমান কে গোপন করি। দ্বিতীয়ত মক্কায় থাকলে নবী (সাঃ) এর আদেশ ও পালন হতো। সন্ধির শর্ত ও ভঙ্গ হতো না।

মুসলমান ভায়েরা আমার! আবু বসীর, আবু জান্দাল (রাঃ) সে দিন স্বন্ধির তোয়াক্কা না করে, ফতুয়া তালাশ না করে, আরামের জীবন হারাম করে, সুখ স্বাচ্ছন্দের জীবনে লাথি মেরে, সমুদ্র এলাকায় কষ্টের জীবন বেঁছে নিলেন। আল্লাহ্ পাক তাদের রাস্তা আসান করে দিলেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থঃ যারা আমার রাস্তায় জিহাদ করে আমি তাদের কে অসংখ্য রাস্তার সন্ধান দেই।

তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা হলো, মক্কার কাফিররা সমুদ্র উপকূলের রাস্তা ধরে সিরিয়া দেশে গিয়ে মালামাল খরিদ করে স্বদেশ ফিরতঃ পথিমধ্যে আবু বসীরের ক্ষুদ্র বাহিনী জালেম কাফিরদের মাল লুন্ঠন

করিয়া নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতেন। শেযতক মক্কার কাফিররা এ ক্ষুদ্র বাহিনীর কাছে পরাজিত হল। এ গেরিলা বাহিনীর উপর কোন আইন চলত না। তাঁরা কারো ধার ধারে না। কোন শর্ত-সন্ধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। আকস্মিক হামলা করে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়। জালেম কাফিররা অসহায় হয়ে হুজুর (সাঃ) এর কাছে এসে মিনতি করে প্রার্থনা জানাল, তিনি যেন আত্মীয়তার বন্ধনের দিকে চেয়ে হলেও ঐ ক্ষুদ্র বাহিনীকে লুটতরাজ হতে মানা করেন এবং ব্যবসায়ী কাফেলা কে বিপদ মুক্ত করেন। বোখারী শরীফে আছে, হুজুর (সাঃ) এর অনুমতি পত্র যখন তাদের হাতে পৌছল, তখন আবু বসীর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় শায়িত, প্রিয় নবী (সাঃ) এর পত্রখানা হস্তগত হওয়ার সাথে সাথে অশ্রুস্বজল নয়নে জান্নাতবাসী হন।

ভায়েরা আমার! হুজুর আকরাম (সাঃ) এর যুগে আরবের বুকে তিনজন সাহাবী শ্রেষ্ঠ সুন্দর ছিলেন। তাঁরা আরব জাহানে শ্রেষ্ঠতম সুন্দর ব্যক্তি ছিলেন। তাদের সৌন্দর্য্য দেখে আরবের লোকেরা বিস্মিত হতো। রাস্তা চলার সময় পথিকেরা তাদের দিকে তাঁকিয়ে থাকতো অপলক দৃষ্টিতে। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে মানুষ পায়ের গোড়ালী উচুঁ করে গভীর দৃষ্টিতে দেখে নিত তাদের সুন্দরতম চেহারা খানি। এক নজর দেখলেই ভুলে যেত আগে পরের সব দুঃখ-বেদনা।

সেই তিন জনের মধ্য হতে একজন হলেন দেহ্ইয়া কালবী (রাঃ)। যার সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে ঐশীদূত হযরত জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে হযরত রাসূল করীম (সাঃ) এর কাছে অবতীর্ণ হতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত খোবায়েব বিন আদি (রাঃ)। যার আলোচনা আমি কিছুক্ষণ পরই পেশ করবো। তৃতীয় ব্যক্তি হযরত হোজাফা সাহ্মী

(রাঃ)। তদানিন্তন আরব বাসীর কাছে জাতীয় কবি হিসাবে যিনি স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যার সাহিত্যকথা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। তিনি হলেন হযরত খোবায়েব বিন আদি (রাঃ)। আরবের লোকেরা মন্তব্য করতেন, খোবায়েব (রাঃ) এর মত এমন সুসাহিত্যিক ও উচ্চাঙ্গের কবির পায়ের ছোঁয়া আরবের জমীনে অতীতে আর কখনও লাগেনি কিন্তু দুঃখের বিষয়! এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও আজ তিনি উকবা বিন আমেরের হাতে বন্দী। উদ্বন্ধন রজ্জুর অপেক্ষমান। যায়েদ (রাঃ) কে অতি সহজেই শহীদ করে দেয়া হয়েছিল কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বিজ্ঞ-বিচক্ষণ খোবায়েব (রাঃ) কে দুশমনরা গোপনে ফাঁসি দিয়ে প্রাণ নাশ করতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য শহর বন্দরে ঘোষণা দেয়া হল, অমুক তারিখে খোবায়েব (রাঃ) কে ফাঁসি দেয়া হবে। জোর প্রস্তুতি চলল। কাফিরদের ঘরে ঘরে উৎসব আরম্ভ হলো।

হযরত খোবায়েব (রাঃ) তিনটি শর্ত আরোপ করলেন, যথা (১) তোমাদের কাছে থাকাকালীন যখন আমি পানি চাবো, তখন আমাকে ঠান্ডা পানি পান করাবে। (২) যখন আমার খাবারের জন্য গোস্ত রান্না করবে তখন হালাল গোস্ত রান্না করবে। (৩) ফাঁসির তিন দিন পূর্বে আমাকে অবহিত করবে। শর্ত মোতাবেক যখন ফাঁসির তারিখ জানানো হল। হযরত খোবায়েব (রাঃ) বললেন আমাকে একটি উস্তরা (চাকু) দাও। সেই উস্তরা দ্বারা তিনি পরিচ্ছন্নতা হাসিল করলেন। খোবায়েব (রাঃ) বললেন, আমি সাত টুকরা হয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে যেতে চাই। সাত অংশে ভাগ হয়ে আমি মহান আল্লাহর দরবারে পেশ হতে চাই।

ভায়েরা আমার! তওবা করো! সাহাবীগনের শানে অমূলক কথা বলো না। সাহাবায়ে কিরামের রাসূল প্রীতির নমুনা লক্ষ্য করো! শহীদ হওয়ার তামান্না দেখো! কিভাবে শহীদ হয়েছেন তাঁরা রাসূলের প্রেমে! ফাঁসির রশ্মি তাদের কাছে অতীব প্রিয় মনে হতো।

সমগ্র আরবে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, আরবের সবচেয়ে বড় কবি ও সাহিত্যিক হযরত খোবায়েব বিন আদি (রাঃ) কে ফাঁসি দেয়া হবে। দুর দুরান্ত থেকে বহু লোকের সমাগম হলো মক্কার মাটিতে। অসংখ্য নর-নারী ভিড় জমালো হযরত খোবায়েব (রাঃ) এর করুণ দৃশ্য অবলোকন করার জন্য, তাঁর এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে কাফিররাও কেঁদে উঠলো। মহিলারা তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে উকবা! তুমি খোবায়েব (রাঃ) এর পরিবর্তে আমাদেরকে হত্যা করে দাও! তাঁর বদলায় আমাদের কে জবাহ করে দাও। এমন সুন্দর নওজোয়ান ও দেশের শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিককে কেন নির্দয় ভাবে হত্যা করছো? উকবা বললো, একটি শর্ত সাপেক্ষে খুবায়েব কে মুক্তি দিতে পারি। শর্তটি হলো এই যে, খুবায়েব শুধু এতটুকু বলবে যে, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে ছেড়ে দিলাম। তখন লোকজন এক হয়ে খোবায়েব (রাঃ) এর কাছে এ প্রস্তাব পেশ করলো, হযরত খুবায়েব (রাঃ) অগ্নিশর্মা হয়ে দীপ্ত কণ্ঠে জওয়াব প্রদান করলেন, যদি আমি প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ত্যাগ করি, তাহলে এ পৃথিবীতে আমার জীবিত থাকার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তো জীবিত থাকি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইজ্জত বুলন্দির জন্য। আমি মরতেও রাজি মুহাম্মদ (সাঃ) এর ইজ্জতের জন্য। কাফিররা ব্যর্থ হয়ে হযরত খোবায়েব (রাঃ) কে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত

করলো। তাকে বলা হলো, তোমার মনের আখেরী বাসনা ব্যক্ত করো! হযরত খুবায়েব (রাঃ) দুই রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলেন। নামাজের অনুমতি পেলে তাড়াতাড়ি দুই রাকাত নামাজ শেষ করে বললেন, আমার জীবনে কখনও এত তাড়াতাড়ি নামাজ পড়িনি। যা আজ পড়লাম। যাতে করে শত্রুরা ভুল না বুঝে বসে যে, মৃত্যুর ভয়ে মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাহাবী নামাজকে দীর্ঘায়িত করেছেন। অতঃপর হাত উঠিয়ে ফরিয়াদ করলেন,

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নবী (সাঃ) এর নামে প্রাণ উৎসর্গ করছি! আমার এ কতলের সংবাদ আমার প্রিয় নবী (সাঃ) এর কাছে পৌঁছে দাও। বলেই কিছু কবিতা পাঠ করলেন! যার প্রথম অংশ হলো ঃ

فَلَسْتُ اُبَالِيْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا
بِاَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ
وَذٰلِكَ فِيْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَّشَأْ الخ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আজ আমি এজন্য আনন্দিত যে, আমি তোমার হাবীব মুহাম্মদ (সাঃ) এর নামে জান দিতেছি। তোমার নামে প্রাণ উৎসর্গ করছি।

যখন আমি শহীদ হয়ে যাবো, তখন আর আমার কোন পরওয়া নেই, চায় তারা আমাকে উল্টিয়ে-লটকিয়ে রাখুক, কিংবা সোজা করে রাখুক! কেননা বকরীকে যখন জবাহ্ করে দেয়া হয়, তখন তার আর কোন পরওয়া থাকেনা। তাকে উল্টিয়ে ঝুলানো হয়। চামড়া উঠানো হয়। হে আল্লাহ! তুমি যদি ইচ্ছে করো তাহলে আমার টুকরো শরীরের

মধ্যেও বরকত দিতে পার। অবশেষে হযরত খুবায়েব (রাঃ) কে ফাঁসির কাষ্ঠে চড়ানো হলো।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত খুবায়েব (রাঃ) ফাঁসির কাষ্ঠে দন্ডায়মান হলেন, সমগ্র পৃথিবী এ করুণ দৃশ্য দেখে কাঁপতে শুরু করছে। তাঁর নবী প্রেম দেখে সব কিছু তড়পাতে শুরু করল। মহিলাগণ তাঁর গুনাবলী বর্ণনা করতে লাগলো, আরবের বুকে এরকম বড় বাহাদুর আমাদের নজরে পড়েনি। যিনি মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলেন। শেষতক কাফির দল তাঁর প্রতি লক্ষ্য করে একযোগে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো, এ সময় তিনি কাফেরদের উপর বদদু'আ করলেন, اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا

অর্থঃ- হে আল্লাহ্! তুমি এদের সকলকে হিসাব করে রেখো! তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে হত্যা করো!
হে আল্লাহ্! তুমি ওদের সবকে কঠিন শাস্তি দাও। কেহ যেন এ দুনিয়ার শাস্তি হতে রেহাই না পায়।

মুসলমান ভায়েরা আমার! আমরা আন্দোলন করি, আমাদের বাক স্বাধীনতার জন্য, আমাদের বেকারত্ব দুরীকরণের জন্য, আমরা আন্দোলন করি, আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য, আমাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হযরত খোবায়েব (রাঃ) ফাঁসির কাষ্ঠে যে মুহাম্মদ (সাঃ) এর জন্য ঝুলে ছিলেন, তাঁর আন্দোলন, তাঁর যুদ্ধ, তাঁর চেষ্টা -প্রচেষ্টা কোন জিনিসের জন্য ছিল? নিশ্চয় উহা কোন ক্ষমতা গ্রহণের যুদ্ধ ছিলনা। উহা কোন সাধারণ ব্যক্তিগত আন্দোলন বা যুদ্ধ

ছিল না। বরং উহা তো তাঁর রিসালাত প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ ছিল। উহা তাঁর খোদা প্রদত্ত পয়গাম্বরীর যুদ্ধ ছিল। মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এর মুহাব্বতের যুদ্ধ ছিল। হযরত খোবায়েব (রাঃ) নবীর মুহাব্বতে প্রানোৎসর্গ করলেন। আজ আমরা ঐ মহব্বতেই, ঐ ইশ্‌কেই প্রাণ উৎসর্গ করতে চাই। সব কিছু কোরবান করতে চাই।

আমার ভায়েরা! ইসলামের ইতিহাস শহীদানদের রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস। একথা সবারই জানা থাকা দরকার। এতো একজন সাধারণ শহীদের কথা বললাম । উহুদের ময়দানে এ রকম একজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন, যাঁর এক পা ছিল না। তাঁর নাম হলো হযরত আমর ইবনুল জুমুহ্ (রাঃ)। তিনি যখন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন হুজুর (সাঃ) বললেন এই ব্যক্তি মা'জুর ছিলেন, অতএব তাঁর লাশ উটের পিঠে উঠিয়ে মদিনায় নিয়ে চল। যখন উটের পিঠে লাশ উঠানো হলো, তখন উট আর সামনে চলছিল না। হুজুর (সাঃ) তাঁর ছেলের কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার আব্বা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন দু'আ করেছিলেন কি? ছেলে উত্তরে বললেন, আমার আব্বা ঘর থেকে জিহাদে আসার সময় দু'আ করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَرُدَّنِىْ إِلٰى أَهْلِىْ

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি জিহাদ থেকে আমাকে আর বাড়ী ফিরাইওনা! হুজুর (সাঃ) তাঁর কথা শুনে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছেন, সুতরাং তাঁকে উহুদের পাহাড়ে দাফন করে দাও।

তাঁরা দ্বীনের জন্য শহীদ হওয়ার কেমন আকাংখা করতেন, লাশটা বাড়ী ফিরে না আসুক, সেজন্য তিনি আল্লাহর কাছে বার বার দু'আ করেছেন। তিনি যদি লেংড়া হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে তোমরা সুস্থ্য সবল হওয়া সত্ত্বেও কেন জিহাদে অংশ গ্রহণ করছো না? কি জবাব দিবে আল্লাহর কাছে?

দোস্ত! আল্লাহর কাছে দন্ডয়ামান হতে হবে। সেদিন আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হব। আল্লাহপাক বলবেন, নবী (সাঃ) এর লেংড়া সাহাবী যার উপর আমি জিহাদ ফরজ করিনি। তবুও সে জিহাদ করে শহীদ হলো। আর তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা সত্ত্বেও তোমরা তা করনি। আমার এ ফরিজার সাথে কেন তোমাদের আদাওয়াত ছিল? তখন তোমরা অবশ্যই আল্লাহর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

বন্ধুরা আমার! উহুদ যুদ্ধ খতম হওয়ার পর হযরত সা'আদ (রাঃ) এর লাশ পাওয়া গেল না। হুজুর (সাঃ) হযরত নোমান (রাঃ) কে বললেন, হে নোমান! দেখো! সা'আদ কোথায় আছে, জীবিত আছে, নাকি শহীদ হয়ে গেছে। জীবিত পেলে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সালাম বলো! এবং তাকে একথাও বলিও যে, রাসূলুল্লাহ তোমাকে স্বরণ করছে। হযরত নোমান (রাঃ) বলেনঃ প্রথমে আমি জীবিতদের মাঝে তাকে তালাশ করলাম কিন্তু সা'আদ (রাঃ)কে পেলাম না। তারপর-মৃতদের লাশের মাঝে সা'আদ (রাঃ)এর লাশ খোঁজ করে নিলাম কিন্তু সা'আদ (রাঃ)এর লাশের সন্ধান পেলাম না। অতঃপর আহতদের মাঝে খোঁজ করে দেখলাম সা'আদ (রাঃ) আহতদের নীচে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন। আমি নিকটে গিয়ে বললাম, হে সা'আদ! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

তোমাকে সালাম পাঠিয়েছেন। যখন সা'আদ (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ) এর সালামের কথা শুনতে পেলেন, তখন তাঁর চেহারায় আনন্দের ঢেউ উথলে উঠলো। মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো। খুশিতে আঁখিদ্বয় ডাগর হতে লাগলো। যেন মনের অজান্তেই বলে ফেললেন فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

অর্থঃ কা'বা ঘরের রবের কসম, আমি সফল কাম হয়েগেছি। অন্তিম সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সালাম পেয়েছি। হযরত নোমান (রাঃ) বললেন, হে সা'আদ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে ডাকছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে তোমার যেতে হবে। খবর শুনে সা'আদ (রাঃ) উঠতে চাইলেন, কিন্তু শত চেষ্টা করেও দাঁড়াতে সক্ষম হলেন না। জখমের কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে। হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মোলাকাতের জন্য পুনরায় চেষ্টা করেও দাঁড়াতে ব্যর্থ হলেন। অনেকবার চেষ্টা করলেন, অন্তিম মুহূর্তে প্রিয়নবী (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কিন্তু বার বার চেষ্টা করেও যখন চলতে সক্ষম হলেন না, তখন নিরাশ হয়ে বললেন! হে নোমান! তুমি প্রিয় নবী (সাঃ) এর কাছে আমার সালাম বলে দাও এবং একথা জানিয়ে দাও যে, সা'আদের এখন অন্তিম মুহূর্ত। দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়। সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। অতঃপর শেষ অছিয়ত হিসাবে বললেন, হে নোমান! তুমি আমার কওম আনছারীদের কে একত্রিত করে বলবে যে, তোমাদের সরদার দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তোমরা যতদিন বেঁচে থাকবে, নবী (সাঃ) কে হিফাজত করবে। যুদ্ধের ময়দানে নবী (সাঃ) এর অগ্রে-পশ্চাতে ডানে-বামে থেকে যুদ্ধ করবে। নবী (সাঃ) এর গায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে। সে দিকে তোমরা লক্ষ্য রাখবে। যে কোন

ধরণের হামলা তোমরা বুক পেতে মেনে নিবে। তোমাদের একটি সদস্য বেঁচে থাকা পর্যন্ত নবী (সাঃ) যেন কষ্ট না পায় সে দিকে খেয়াল রাখবে। কথা গুলো শেষ করে হযরত সা'আদ (রাঃ) কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে এ দুনিয়া থেকে ইতি নিলেন।

নোমান (রাঃ) বলেনঃ নবী প্রেমের এদৃশ্য দেখে আমি সারারাত ক্রন্দন করতে থাকি এবং ঘটনাটা নবী আকরাম (সাঃ) এর কাছে বর্ণনা করি। ঘটনা শুনে নবী আবাবী (সাঃ) এর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। নবী করীম (সাঃ) হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলেনঃ হে আল্লাহ! আমি সা'আদের উপর সন্তুষ্ট, তুমি ও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হযরত নোমান (রাঃ) বলেন, কিছু দিন পর আমি হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) কে দেখলাম যে তিনি ঘরের বাহিরে পায়চারী করছেন এবং তাঁর কাঁধে একটি ছোট বাচ্চা খেলা করছে। আমি বললাম, হে আবু বকর (রাঃ)! এই বাচ্চাটা কি আপনার? হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, না এটা আমার বাচ্চা নয়। হযরত নোমান (রাঃ) বললেন, আপনার ছেলে আব্দুর রহমানের বাচ্চা? হযরত আবুবকর (রাঃ) বললেন, না এটা আমার ছেলে আব্দুর রহমানের বাচ্চা ও নয়। হযরত নোমান (রাঃ) বললেন, তাহলে এটা কার বাচ্চা? বারবার চুম্বন করছেন, অতি আদর স্নেহ করে তাকে কোলে জড়িয়ে আছেন। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) আর কান্না চেঁপে রাখতে পারলেন না। আঁখিদ্বয় অশ্রুসিক্ত করে বললেন! হে নোমান! তোমার কি জানা নেই যে, এটা হযরত সা'আদ বিন রাবি (রাঃ) এর ইয়াতিম বাচ্চা? এজন্যই তো আমি বাচ্চাটিকে বারবার চুমু দিচ্ছি। আদর স্নেহ করছি।

আহ্! মুহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে হযরত সা'আদ (রাঃ)এর কি গভীর সম্পর্ক ছিল যে, জীবন সায়াহ্নে হযরত রাসূল করীম (সাঃ) এর কথা স্বরণ হলো, আখেরী নবী (সাঃ) এর সাথে আখেরী মোলাকাতের ইচ্ছা হলো, কিন্তু তাঁর ছোট বাচ্চার কথা স্বরণ হলো না। রাসূল (সাঃ)এর মুহাব্বতে আত্মহারা হয়ে ছোট বাচ্চাটির কথা একেবারেই ভুলে গেলেন। শেষ অছিয়তের সময় রাসুল (সাঃ) এর কথা বার বার বললেন, কিন্তু শিশু বাচ্চার কথা কিছুই বললেন না। জীবন সঙ্গীনী স্ত্রীর কথা কিছুই বললেন না। অসহায় বিধবা স্ত্রীর কথা তার একবারের জন্যে মনেও হলো না। মাতা-পিতা ভাইবোনের কথা একটুও স্মরণ হলো না।

মুসলমান ভায়েরা! তোমরা লক্ষ করো! যে সকল সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইজ্জতের জন্য, নিজেদের আদরের বাচ্চাদের কে পর্যন্ত ভুলে যেতেন, আজ শিয়ারা তাদের ব্যাপারে মন্তব্য করছেঃ তাঁরা সকলেই ছিলেন কাফির। সকলেই ছিলেন মুরতাদ। (নাউযুবিল্লাহ্)।

যাঁরা নিজেদের বুকের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ইজ্জতকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আজ সে সকল সাহাবায়ে কিরামকে কাফির বলা হবে আর আমি তাদের মোকাবালা করবো না, সাহাবায়ে কিরাম কে শিয়ারা মুরতাদ বলবে, আর আমি তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবো না, তাঁদেরকে বেঈমান বলা হবে, আমি মুখে তালা লাগিয়ে থাকবো, এটা কোন দিন হতে পারে না। জেনে রেখো! নিজের জান সহ সব কিছুকে কোরবানী করে হলেও, ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে হলেও সাহাবায়ে কিরামের ইজ্জত ও আবরুর হিফাজত করবো ইনশাআল্লাহ্। যাঁরা সাহাবায়ে কিরামকে গাল মন্দ করে

তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে মৃত্যুবরণ কারী খোমেনীকে প্রয়োজনে কবর থেকে উঠিয়ে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির নজির কায়িম করতে হবে। সাহাবাদের দুশমনদেরকে মুসলমানের মাটিতে ইসলাম ও মুসলমানের নাম ধরে থাকতে দেয়া হবে না।

সাহাবাদের পরিপূর্ণ অনুস্মরণকারী মুসলমানদেরকে স্বমূলে নিপাত করার জন্য, শিয়া খোমেনী কত ধরণের প্রোপাগান্ডা ও যড়যন্ত্র করেছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। কখনো তারা আমাদের কে ফেতনাবাজ বলে, কখনো সাম্প্রদায়িক বলে, আবার কখনো মৌলবাদী বলে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছে।

ভায়েরা আমার! আমরা অনেক দিন পর্যন্ত সাহাবাদের কে গালি দেয়া সহ্য করেছি। বহুদিন যাবৎ সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ ও গালমন্দ সম্বলিত অনেক অশ্লীল বই পুস্তক সহ্য করে আসছি, কিন্তু এখন আর তা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। এবার নেবো প্রতিশোধ। যারা হযরত আবু বকর, উমর, উসমান (রাঃ) এর মত বিশিষ্ট সাহাবীদের কে গাল মন্দ করে, তাদের কে কাফির বলে আমরা তাদের কে বলছি, তোমরা তওবা করে ইসলামে ফিরে এসো। নয়তো তোমাদেরকে হত্যা করবো। এ শক্তি আমাদের রয়েছে ইনশাআল্লাহ্।

ভায়েরা আমার! আমাদের ইতিহাস তথা মুসলমানদের ইতিহাস শহীদানের রক্তে রাঙা ইতিহাস। শাহাদাত আমাদের নিকট খুব প্রিয় বস্তু। কেননা শাহাদাতের মাধ্যমে আমাদের সম্মান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ হয়। আমরা শহীদানের উত্তরসূরী। শাহাদাত আমাদের কাম্য। শহীদের ইজ্জত আমাদের কাছে যথেষ্ট রয়েছে।

হযরত হোজাফা (রাঃ) এর শাহাদাতের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) এর যুগে যখন মুসলমানদের সাথে রোম সম্রাটের যুদ্ধ শুরু হয়, তখন এক পর্যায়ে রোমীয়রা ছয়শত সাহাবী কে গ্রেফতার করে বাদশার কাছে প্রেরণ করে। গ্রেফতারকৃত সাহাবীদের মধ্যে একজন হযরত হোজাফা (রাঃ) ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে বাদশাহ মুগ্ধ হয়ে সকল বন্দীদের কে মুক্ত করে দিলেন এবং হযরত হোজাফা (রাঃ) কে কাছে ডেকে নিলেন। বাদশাহ হোজাফা (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন তোমার পরিচয় কি? হোজাফা (রাঃ) উত্তর দিলেন আমি সাহ্মী করিলার লোক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাহাবী। আমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালবাসি। তাঁর কথায় জীবন যাপন করি, তাঁর কথায় মরতেও পারি। বাদশাহ আফসোস করে বললো, তোমার মত এমন একজন টগবগে যুবক মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুস্মরণ করে? তুমি মুহাম্মদ (সাঃ) কে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব। আমার রাষ্ট্র পরিচালনায় তোমাকে অংশীদার বানাবো। আমার সুন্দরী মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দেবো। হযরত হোজাফা (রাঃ) গর্জে উঠে জবাব দিলেন। আমার জীবন মরণ সবই মুহাম্মদ (সাঃ) এর সন্তুষ্টির জন্য। এসব প্রলোভন দেখিয়ে রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ থেকে বিন্দু পরিমাণও হটাতে পারবে না। বাদশাহ তাঁর দৃঢ়তা দেখে বললো হোজাফা! তুমি কঠিন সমস্যায় পড়বে। ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। হযরত হোযাফা (রাঃ) হাসি মুখে উত্তর প্রদান করলেনঃ যদি এ কঠিন সমস্যা, ভয়াবহ শাস্তি মুহাম্মদে আরাবী (সাঃ) এর কারণে হয় তাহলে তো এটা কোন কষ্টের ব্যাপার নয়, আনন্দের ব্যাপার। এবার বাদশাহ নতুন ফন্দি আটলো, হোযাফা (রাঃ) কে একটি কামড়ায় আট দিনের

জন্য আবদ্ধ করলো। কামড়াটি ছিলো খুব আরামদায়ক। সব ধরণের আনন্দ ও চিত্তবিনোদনের বস্তু সেখানে মজুদ ছিলো। বাদশাহ্ ভাবছিল এবার হয়ত তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিবে।

কিন্তু আট দিন পরও তাঁর মজবুত ঈমানে সামান্য পরিবর্তন দেখা গেল না। তিনি আবদ্ধ ঘরে সারারাত কোরআন তিলাওয়াত করতেন, সারাদিন নামাজে রত থাকতেন। প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় নবীজি (সাঃ) কে স্মরণ করে ক্রন্দন করতেন। অশ্রুসিক্ত করে ফেলতেন নয়ন যুগল। আট দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তাকে বাদশাহের সামনে পেশ করা হলো। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন হোযাফা! এখন তোমার মনোভাব কি রকম? হোযাফা (রাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, আমার অবস্থা পূর্বের ন্যায়। আমি আমার সিদ্ধান্তের উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ঈমানের বলে বলীয়ান। রাসূল (সাঃ) এর মুহাব্বত আমার অন্তরে আলো ছড়াচ্ছে। বাদশাহ রুঢ় কণ্ঠে বলল। এখনই তোমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বাদশাহ জল্লাদকে নির্দেশ দিলো, হোযাফা (রাঃ) কে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দাও। নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে দেয়ালের সাথে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল। হোযাফা (রাঃ) এর হাত পা লম্বা করে দেয়ালের সাথে লোহার পেরাগ মেরে দেয়া হল। শরীরে কাপড় নেই। পবিত্র মুখ থেকে কালিমায়ে তায়্যিবার আওয়াজ বের হয়ে আসছে। আট দিন ধরে নবী আরাবী (সাঃ) এর এক সাহাবীকে দেয়ালের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কঠিন শাস্তিতে নিপতিত। এ ভয়াবহ মুছিবতে আক্রান্ত হয়েও যখন কালিমা পরিত্যাগ করছেন না, মুহাম্মদ (সাঃ) কে পরিহার করছেন না, তখন বাদশাহ খুব তেজস্বী আগুন প্রজ্জলিত করার নির্দেশ দিলেন। বাদশার নির্দেশ অনুযায়ী আগুন প্রজ্জলিত করা হলো।

তাতে একটি বড় ডেগ তুলে দেয়া হল। কিছুক্ষণ পর ডেগে তেল ঢালা হল। যখন তেল গরম হতে লাগলো। হযরত হোযাফা (রাঃ) কে বলা হলো হোযাফা দেখ! এটা তোমার আখেরী সুযোগ। এ সুযোগ গ্রহণ করলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবে। হযরত হোযাফা (রাঃ) বড় সাহসিকতার সাথে বলে উঠলেন, আমি এখনও রাসূলে খোদা মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত কালিমা "কালিমায়ে শাহাদাত" পাঠ করছি।
আমি কোন রকম ভীত হয়নি। এবার বাদশা ক্রোধান্বিত হয়ে জল্লাদকে নির্দেশ করলো। এখনই ওকে জ্বলন্ত তেলে নিক্ষেপ কর। জল্লাদ হোযাফা (রাঃ) কে উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করলো। গরম তেল উথলিয়ে পড়ছে। আর হযরত হোযাফা (রাঃ) গরম তেলে হাবুডুবু খেয়ে দ্বগ্ধ হচ্ছে। চার ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাদশাহ বললো এখন হোযাফার শরীরের সম্পূর্ণ গোস্ত তেলের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এবার তাঁর হাড্ডি গুলি বের করে নিয়ে এসো। হাড্ডি বের করতে গিয়ে দেখতে পেল হোযাফা (রাঃ) সম্পূর্ণ সুস্থ্য শরীরে গরম তেলে অবস্থান করছেন। তাঁর শরীর তো দুরের কথা, তাঁর একটি লোমও আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়নি। কেননা আগুন জ্বলে আল্লাহর হুকুমে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল। আগুন হোজাফা (রাঃ) এর জন্য পানি হয়ে গেল।

হে মুসলমান বন্ধুরা! হোযাফা (রাঃ) একজন সাহাবী। আমাদের নয়ণ মণি! পয়গাম্বর (সাঃ) এর সন্তুষ্টে প্রাণ উৎসর্গকারী। আজ এ সকল সাহাবায়ে কিরামকে যে যবান গাল মন্দ করবে আমি তাঁর জিহবা কেঁটে দিব। যে কলম তাদের বিরুদ্ধে কোন অক্ষর লিখবে, আমি তার হাত মোচঁড়ে দিব। এমন একজন সাহাবীর জন্য আমরা দলে দলে প্রাণোৎসর্গ

করব। আমাদের সর্বস্ব বিলীন করে দিব। তবুও তাদের সম্মান সমুন্নত রাখবো ইনশাআল্লাহ্। আজ তোমাদের হোসাইন (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন শহীদের কথা স্মরণ নেই।

হযরত ওমর (রাঃ) এর শাহাদাতের কথা তোমরা বে-মালুম ভুলে বসেছো। আজ যারা হযরত হোসাইন (রাঃ) এর দোহাই দিয়ে ওমর (রাঃ)কে ও উসমান (রাঃ)কে কাফির বলে। সমস্ত সাহাবায়ে কিরামকে কাফির বলে। আমরা যদি এদের সমুচিত জবাব না দেই তাহলে কাল কিয়ামতের ময়দানে ওমর, উসমান তথা সমস্ত সাহাবাদের সামনে আমাদের লজ্জিত হতে হবে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী এদেশে এসেছিল। আমরা তার সাথে শিয়াদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু অনিবার্য কারণ বশত তা হয়নি। তারপর ইরান সরকারের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের এক রাজনীতিবিদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পয়গাম আসল যে, সঠিকভাবে বলো-তোমাদের সাথে আমাদের মত-বিরোধটা কি? হে শিয়া সম্প্রদায়! তোমরা প্রশ্ন কর তোমাদের সাথে আমাদের মত-বিরোধটা কোথায়? হে মুসলমান বন্ধুরা! আজ ইরান সরকার আমাদেরকে পয়গাম দেয় যে তাদের সাথে আমাদের মত-বিরোধ কি? আমরা তার জবাবে খোমেনীর লিখিত কিতাব কাশফুল আসরার" কিতাবটি ইরান সরকার প্রধান রাফসানজানীর কাছে পাঠাতে চাই।
এ কিতাবের একশত উনিশ নম্বর পৃষ্ঠায় খোমেনী লিখেছে যে, ওমর আছ্লী কাফির ওজিন্দিক ছিল।

মুসলমান ভায়েরা আমার! আমরা ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করছি না, আমরা সাহাবায়ে কিরামের ইজ্জত রক্ষার্থে সংগ্রাম করছি। খোমেনীর

এ জঘন্য লিখা সম্বলিত কাশফুল আসরার নামক অশ্লীল কিতাবটি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর কাছে ১৫/২০ দিন পূর্বে পাঠিয়েছি। প্রধান মন্ত্রী বললেন, এর পূর্বে এ ধরণের কিতাব সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। অথচ ইতি পূর্বেও আমরা এ কিতাবের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্যণ করার চেষ্টা করেছি। কিতাবটি ফারসী ভাষায় ইরান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্থানে কিতাবটির উর্দ্দু অনুবাদ হয়ে ব্যাপক হারে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ হচ্ছে। এ কিতাবের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় খোমেনী লিখেছে আমি এমন রবকে রব মানি না যে উসমানের মত বদবখ্ত মানুযকে খলিফা বানিয়েছেন।

মুসলমান ভায়েরা আমার! তোমরা যদি কোন ব্যক্তির কাছে তোমাদের মেয়েকে বিবাহ্ দাও, তাহলে তোমরা সে ব্যক্তিকে শরীফ ও ভদ্র মনে করে থাকো। কিন্তু রাসূল (সাঃ) যে লোকটিকে নির্বাচন করে নিজের স্নেহময়ী দুটি মেয়েকে পর পর বিবাহ্ দিলেন এবং অন্য কোন মেয়ে থাকলে তাও তাঁর কাছে বিবাহ্ দেয়ার আকাংখা ব্যক্ত করলেন, খোমেনী সেই লোকটিকে বদবখ্ত-বদমাইশ বলেছে। হুজুর (সাঃ) এর দুইটি মেয়েকে বিবাহ করে যিনি জিন্নুরাইন উপাধি গ্রহণ করেছেন, আজ চৌদ্দশত বছর পর কুখ্যাত খোমেনী তাকে বদমাইশ বলেছে। যিনি দুনিয়া হতে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে ছিলেন। যার শহীদ হওয়ার সংবাদে চৌদ্দ শত সাহাবা সহ স্বয়ং নবী (সাঃ) মৃত্যুর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। উসমান (রাঃ) এর রক্তের প্রতিশোধ নিতেই হবে, প্রয়োজনে আমরা সকলে শহীদ হয়ে যাবো। সেই উসমান (রাঃ)র ব্যাপারে খোমেনী জঘন্য হতে জঘন্যতম মন্তব্য করেছে।

কাশফুল আসরার কিতাবের ২৫০ নং পৃষ্ঠায় এ মাল্‌উন এমন অপবিত্র উক্তি করেছে, যা মুখে উচ্চারণ করা ও কঠিন ব্যাপার।

সে লিখেছে যে, মানুষ তার লিঙ্গে আবুবকর ও ওমরের নাম লিখে স্বীয় বিবির সাথে মিলামিশা করবে। আহ্! এ সমস্ত কিতাবাদী ছাঁপানোর পরও আমরা কিভাবে শিয়াদেরকে মুসলমান বলতে পারি?

বন্ধুরা আমার! সরকারী শক্তির ভরসা পরিত্যাগ কর। সরকারী শক্তি আমাদের সাথে থাকুক কিংবা না থাকুক। রেডিও, টিভি তথা প্রচার মাধ্যমগুলো আমাদের সহযোগিতা করুক কিংবা না করুক। আমরা যদি এ মুহুর্তে এর উপযুক্ত জবাব না দেই, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সামনে কিভাবে চেহারা দেখাব। যে ব্যক্তিকে নবী করীম (সাঃ) তাঁর রওজা মোবারকের সাথে দাফন করার অছিয়ত করেছেন। যে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) চৌদ্দশত বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে শুয়ে আছেন। আজ তাদের সম্পর্কে এমন জঘন্য উক্তি সম্বলিত কিতাব এ মুসলমানের দেশের মাটিতে ছাঁপা হয়। তার লেখক ও জীবিত আছে। ঐ কিতাব সরবরাহকারী লাইব্রেরী বাকী আছে। প্রেস বাকী আছে। এসব বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আহ্! আমি কি বলবো, তোমরাই বলো সরকার যদি আমার সহযোগিতা না করে, আমি কি শিয়াদেরকে কাফির বলবো না? শিয়াদের কুফুরীর ঘোষণা করবো না? তাদের কোন মোকাবালা করবো না? এটা হতে পারে না। ওরা অন্য কাফিরের চেয়েও বড় কাফির। কেননা অন্যান্য কাফের গোষ্ঠী ইসলামের তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু শিয়ারা মারাত্মক ক্ষতি করছে।

হে মুসলমান! আজ যদি তোমাকে বদমাইশ বলা হয় তাহলে প্রতিবাদ করতে ও প্রতিশোধ নিতে বিন্দু মাত্র অবহেলা করো না। এখন বিচার করো যে, যদি কোন ব্যক্তি আবুবকর কে বদমাইশ বলে, তাদের সম্পর্কে বলে যে, মানুষ আবুবকরের নাম স্বীয় লিঙ্গে লিখে আপন স্ত্রীর সাথে মিলিত হোক! ওমরের নাম লিখে স্বীয় বিবির সাথে মিলিত হোক। এখন তোমরা ফায়সালা করো, ইনসাফ করো! আমি কি করবো এ মুহুর্তে, আমি কার দরবারে এ ফরিয়াদ পেশ করবো। তোমারাই বলো! যদি লড়াই আমার ব্যক্তিত্বের জন্য হতো! যদি এ লড়াই আমার জমির জন্য হতো, তাহলে আমাকে বাধাঁ দিলে, আমার উপর লাঠি চার্জ করলে, আমাকে গ্রেফতার করলে, আমার উপর কঠোরতা করলে, মনে এক প্রকার বুঝ দিতে পারতাম? কিন্তু এ লড়াই তো সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)এর ইজ্জতের জন্য, হযরত ওমর (রাঃ) এর সম্মান রক্ষার জন্য। এ লড়াই হতে কেমনে আমি পিছপা হবো। ব্যক্তির চেয়ে দ্বীন বড়। দ্বীন সমুন্নতকারী সাহাবায়ে কিরামের জন্যে আমি একা নয়। আমার মত লক্ষ কোটি জান কোরবান করলেও তাদের ঋণ পরিশোধ হবে না।

খোমেনী মালউন তার কিতাবে লিখেছে। আবু বকরের ঈমান শয়তানের ঈমানের বরাবর। হে মুসলমান ভায়েরা! আজ আমরা নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ব্যস্ত! আমরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত রয়েছি। এ দিকে সাহাবায়ে কিরামের খিলাফ, নবী আকরাম (সাঃ) এর খিলাফ কিতাবাদি ছাঁপছে। তাই পরস্পর স্বার্থের যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করো। ক্ষমতার লড়াই ছাড়ো, এসো সকলে মিলে সিদ্দিকে আকবার (রাঃ) এর ইজ্জতের লড়াই করি।

গত ১লা মহ্‌ররম পাকিস্তান রেডিও টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো আজ এ দিনে কোন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন কি? উত্তরে মজাকের স্বরে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর নাম উচ্চারণ করা হলো এবং নামুচ্চারণের পর বলা হলো যে, আসল জিনিস তো হযরত হোসাইন (রাঃ)। তারপর কয়েক ঘন্টা ব্যাপী এ দীর্ঘ অনুষ্ঠানে শুধু হযরত হোসাইন (রাঃ) এর গুনাবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হলো। হযরত হোসাইন (রাঃ) এর কোন গুনাবলী আমরা অস্বীকার করি না। তিনি আমাদের মাথার তাজ, কলিজার টুকরা কিন্তু ১লা মহ্‌ররমের দিনে ফারুকে আযমের নাম একবার মজাকের সাথে নিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় বার তাঁর নাম উচ্চারণ না করা, একথাই প্রমাণ করে যে, ফারুকে আযমের সাথে তাদের শত্রুতা রয়েছে। আজ আমি পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশনের ডাইরেক্টর এর প্রতি দৃষ্টি আকর্যণ করে বলছি। পাকিস্তানের এই মিডিয়া শিয়াদের মিডিয়া নয়। ইহা সুন্নীদের মিডিয়া। রেডিও টেলিভিশন তোমাদের কোন পৈত্রীক সম্পদ নয়। ইহা সুন্নীদের জাতীয় সম্পদ। কাজেই এখানে শিয়াদের মাজহাব প্রচার করা যাবে না। শিয়াদের সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না।

বন্ধুরা আমার! আমি আপনাদের সামনে শহীদানদের ইতিহাস আলোচনা করলাম। আপনারা তাদের ঐতিহাসিক ত্যাগ তীতিক্ষা অনুভব করতে পারলেন! এখন আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো যে, শিয়া রাফেযী সহ সকল গোমরা ফেরকা ও কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে আমরণ জিহাদ করা।

আমরা যাদের উত্তরসূরী

উহুদের যুদ্ধে এমন একজন সাহাবী শহীদ হয়েছেন যিনি দুনিয়াতেই জান্নাতের খুশবু পেয়েছেন। তাঁর দেহে ৮০ টারও বেশী তরবারীর আঘাত ছিল। তীরের আঘাতে চালুনীর মত ছিদ্র হয়েছিল তার শরীর। মানুষ বলে চেনা যাচ্ছিল না তাকে। তাঁর ভগ্নি আঙ্গুলের কর দেখিয়া সনাক্ত করেছিলেন। তিনি হলেন হযরত আনাস বিন নজর (রাঃ)। মুসলিম বাহিনী যখন কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছিলেন। এ মুহুর্তে আনাস (রাঃ) সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এ সময় দেখিলেন সম্মুখ দিক হতে হযরত সা'আদ (রাঃ) আসিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হে সা'আদ! তুমি কোথায় যাইতেছ? আল্লাহর কসম! উহুদ পাহাড় হতে জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। একথা বলিয়া উন্মুক্ত তরবারী হাতে কাফিরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং বীর বিক্রমে কাফির মারতে মারতে শহীদ হয়ে গেলেন।

মুসলমান ভায়েরা! উহুদের ময়দানে মুজাহিদগণ জমায়েত হলেন. শত্রুপক্ষ ও পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আবির্ভাব হলো। উভয় দল মোখামুখী অবস্থান গ্রহণ করলো। যুদ্ধের মাত্র এক রাত বাকী। এমন সময় দুইজন সাহাবী নির্জনে বসে দু'আ করলেন, একজন বলিলেন, নাম তাঁর সা'আদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ)। আগামীকাল যখন যুদ্ধ শুরু হবে। তখন শত্রু পক্ষের এমন একজন বীর পুরুষ আমার সম্মুখীন কর। যে আমার উপর ভীষণ আক্রমণ চালাবে, এবং আমিও তাঁর উপর বীর

বিক্রমে আক্রমণ চালাবো, অবশেষে আমি তাকে কতল করে ফেলবো। অপর ব্যক্তি যার নাম আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) তিনি আমীন বললেন।

এবার আব্দুল্লাহ (রাঃ) দু'আ করলেন হে আল্লাহ্! আগামীকাল তুমি আমাকে এমন একজন শত্রুসেনার সম্মুখীন কর যে আমার উপর প্রবল বেগে আক্রমণ চালাবে, আমিও তার উপর ভীষণ হামলা করবো। অতপর সে যেন আমাকে কতল করে ফেলে, আমার নাক কান কেঁটে ফেলে। ওহে প্রভূ । কিয়ামত দিবসে যখন তোমার দরবারে হাজির হব, তখন তুমি জিজ্ঞাসা করবে হে আব্দুল্লাহ্! তোমার নাক কান কাঁটা কেন? আমি বলব, তোমার দ্বীন বুলন্দির জন্য, তোমার প্রিয় নবী (সাঃ) এর হিফাজতের জন্য আমার নাক কান কাঁটা গেছেঁ। আল্লাহ্ বলবেন, সত্যিই আমার রাস্তায় কাঁটা গেছে? আমি বলবো হ্যাঁ। তোমার রাস্তায় কাঁটা গেছে। পরদিন যুদ্ধ শুরু হলে, দেখা গেল, তাঁরা যেভাবে দু'আ করেছিলেন সেই ভাবে কবুল হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ শাহাদাত বরণ করলেন। (মুজাহিদ যতক্ষণ পর্যন্ত শহীদ হওয়ার তামান্না না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শহীদ হবে না। আল্লাহ্ পাক তাদের মনের দিকে বেশী লক্ষ রাখেন।

"পরিবারের সবাই শহীদ"০

খোমেনী সাহাবাগণ কে কাফির বলে, অথচ এমনও সাহাবী ছিলেন। যারা নবী (সাঃ) এর জীবদ্দসায় শাহাদাত বরণ করেছেন। নবী (সাঃ) অনেক সাহাবীকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। বহু সাহাবীর জানাজা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পড়িয়েছেন। নিজ হাতে দাফন কাফন করেছেন, নিজ হাতে কবরে রেখেছেন। বদরের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করে ছিলেন, আল্লাহ পাক তাদের আগে পিছের সকল গুনাহ মাফ

করেছেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন

"অর্থঃ তোমরা যাচ্ছে তাই কর" তোমাদের কোন হিসাব নেয়া হবে না।

এমনও সাহাবী ছিলেন, যাদের গোটা পরিবার নবী (সাঃ) এর মুহাব্বতে দ্বীন প্রতিষ্টায় শাহাদাত বরণ করেছেন।

হযরত আম্মার (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর পিতা ইয়াছির (রাঃ) কে মক্কার কাফিররা মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর শোয়াইয়া অমানুযিক অত্যাচার করত। কাফিরদের অত্যাচারেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আম্মার (রাঃ) এর বৃদ্ধা মাতাও কাফিরদের নির্যাতন হতে রেহাই পাননি, কাফিররা তাঁর মাতা সুমাইয়্যা (রাঃ) কে অমানবিক নির্যাতন করেছিল, তিনিও শেযতক শাহাদাত বরণ করেন।

মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ)এর শাহাদাত

বন্ধুরা আমার! এমনও সাহাবী ছিলেন যিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যাক্তির আদরের দুলাল ছিলেন। যিনি দুইশত দেরহাম মুল্যের কাপড় পড়তেন। কষ্ট কি জিনিয তিনি জানতেন না। অতি নাজ নিয়ামতের ভিতর দিয়া যৌবনে পদার্পন করে ছিলেন। একদিন গোপনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে অমানুযিক নির্যাতন ভোগ করতে হয়। সুযোগ মত একদা পালাইয়া হাবসায় হিজরত করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে আবার মদিনায় হিজরত করেন। বহু কষ্টের ভিতর দিয়া কালাতিপাত করতে ছিলেন। এখন আর তাঁর চেহারায় সেই যৌবনের লাবণ্যতা নেই। অনাহার অর্ধাহার হলো তাঁর নিত্যদিনের সাথী। পরণে

একটি জীর্ণ চাদর। তাতেও আবার তালির অভাব নেই। আবার কোন কোন তালি চামড়ার ও ছিল। তাঁর এ অবস্থা দেখে দয়ার নবী (সাঃ) এর নয়ন অশ্রুতে ভরে গেল। তাঁর পূর্বেকার অবস্থা স্মরণ করে নবী (সাঃ) কেঁদে ফেললেন। উহুদের যুদ্ধে মোহাজেরদের কমান্ডার তিনিই ছিলেন, তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা ছিল।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে জনৈক কাফিরের তরবারীর আঘাতে তাঁর ডান হাত কাঁটা গেল, তিনি মুহূর্তের মধ্যে বাম হাত দ্বারা পতাকা উচুঁ করে ধরলেন। এবার পাযন্ড কাফিররা তাঁর বাম হস্তখানাও কেঁটে ফেলল। তিনি উভয় বাহু দ্বারা বুকে চেঁপে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করে রাখলেন। তখন কাফিররা ইসলামের ঝান্ডা কে পদদলিত করার জন্য চারদিক হতে তীর বর্যা মেরে তাকে শহীদ করে দিল। জীবন থাকতে ইসলামী পতাকার মর্যাদা রক্ষা করলেন। পদদলিত হতে দিলেন না। কাফনের সময় তাঁর কাছে একটি চাঁদর ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। সে চাঁদর ও এত শর্ট ছিল যে, আপাদমস্তক ঢাকা সম্ভব হল না। মাথা ঢাকলে পায়ের দিক খোলা থাকে। আর পায়ের দিক ঢাকলে মাথার দিক খোলা থাকে। হুজুর (সাঃ) দির্নেশ দিলেন, মাথার দিক চাদর দ্বারা ঢেকে পায়ের উপর ঘাস পাতা ছড়িয়ে দাও।

এ হল দুইশত দেরহাম মহামূল্যের জোড়া কাপড় পরিধান কারীর কাফনের অবস্থা। এ সকল সাহাবীগণের ঈমান কত মজবুত ছিল। আমাদের যুগের লোকেরা তাদের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে অনুমান ও করতে পারে না।

শিয়ারা এ সকল লোকদের কে কাফির বলে থাকে। সোনালী যুগের স্বর্ণ মানবগণ কে মুরতাদ বলে। প্রকৃত কথা হল শিয়ারাই

মুরতাদ। এ মুরতাদরাই ওমর (রাঃ) কে শহীদ করেছে, এ মুরতাদরাই উসমান (রাঃ) কে কতল করেছে। এ বেঈমানরাই আলী (রাঃ) কে হত্যা করেছে। ওরাই আমিরে মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আস (রাঃ) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ খবিসদের কারণে জংগে সিফফন, জংগে জামাল সংগঠিত হয়।

বন্ধুরা আমার! ইসলাম ও মুসলমান চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইয়াহুদী খৃষ্টানতো আছেই। হিন্দুরাও মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য পারমানবিক বোমা তৈয়ার করেছে। মুসলমান নাম ধারণ করে কত শত দুশমন, কত শত গ্রুপের জন্ম হয়েছে। তার কোন ইয়ত্তা নেই। খারেজী, রাফেজী, শিয়া, ভন্ডপীর, কাদিয়ানী এসব গ্রুপ বা দল ইসলাম ও মুসলমানের নাম ব্যবহার করে দ্বীনের বৃহৎ ক্ষতি সাধন করছে। এ সময় যদি মুসলিম নওজোয়ানরা হাল ছেঁড়ে দেয়, তাহলে বিদ্বেষীরা ইসলাম নামটুকু দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে কসূর করবে না। এ মূহুর্তে আমাদের করণীয় হল সাহাবায়ে কিরামের আদর্শ গ্রহণ করা। আবুবকর (রাঃ) এর নীতি গ্রহণ করা। ওমর (রাঃ) এর নীতি গ্রহণ করা । উসমান ও আলী (রাঃ) এর আদর্শ গ্রহণ করা। সকলকে সশস্ত্র জিহাদের কাফেলায় শরীক হওয়ার আবেদন রইল।

হযরত উসমান (রাঃ) এর মর্মান্তিক শাহাদাত

হযরত উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের ঘটনা সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলেই আব্দুল্লাহ বিন সাবার কথা আসে। কেননা এ লোকটাই হলো তাকে শহীদ করার মূল নায়ক, এবং বর্তমান শিয়াদের গুরুজী। আব্দুল্লাহ বিন সাবা জাতে ধর্মে হলো একজন কঠর ইয়াহুদী। কেউ কেউ বলেছেন

সে একজন অগ্নিপূজক। বর্তমান এমানের রাজধানী সানায় তার জন্ম। হযরত উসমান (রাঃ) এর খিলাফত কালে সে মদিনায় এসে বুক ভরা নেফাক চেঁপে রেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তারপর কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করে মদিনার অবস্থান এবং মদিনার সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে। ইতিমধ্যে বসরা হতে উসমান (রাঃ) এর কাছে খবর আসে যে কিছু সংখ্যক লোক বসরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, এরা চুরি ডাকাতি অবাধে করছে এবং এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে হাকিম বিন জাবালাহ নামে একজন লোক। খলিফা ওদের নজরবন্দী করে রাখার নির্দেশ দেন এবং উপযুক্ত শাস্তি দেয়ার কথা বলেন। এ খবর আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও শুনতে পায়। সে মনিদায় ইসলামী খিলাফতের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে কোন সুযোগ না পেয়ে বসরায় রওয়ানা হয়। বসরায় গিয়ে সে হাকিম নামে ডাকুর সাথে সাক্ষাত করে। প্রথমে সে এ ডাকু বাহিনীকে হাত করে নেয়, তারপর তাদের সাহায্যে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। সে মদিনায় কিছুদিন অবস্থান করে একটা জিনিয ভালভাবে অনুধাবণ করতে সক্ষম হয় যে মুসলমান কে ধ্বংস করতে হলে সাধারণ মুসলমানকে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে। সে এ ধারায় কাজ শুরু করে। বসরায় সে ডাকু বাহিনীর সাহায্যে খলিফা উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন উক্তি করে। আলী (রাঃ) এর পক্ষে খুব সাফাই গায়, এবং উসমান (রাঃ) এর চেয়ে আলী (রাঃ) কে খিলাফতের বেশী হকদার, একথাও মানুযের মাঝে বলে বেড়ায়। তার এহেন কাজ কারবার বসরার শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আমেরের দৃষ্টিগোচর হলে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন সাবাকে এসব কথা বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর ভাবে নিযেধ করেন। তারপর সে বসরায় নিজের খতরা মনে করে কুফার

দিকে রওয়ানা হয়। কুফায় যাওয়ার পূর্বেই সে খিলাফতে উসমানের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী গ্রুপ তৈয়ার করতে সক্ষম হয়। কুফায় গিয়ে সে নিজেকে মদিনার একজন মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয়। নামায রোজা খুব পাবন্দীর সাথে করে এবং লোক সমাজে এমন ভাবে চলাফেরা করে, মানুষ তাকে একজন সত্যিকার বুযুর্গ মনে করে সম্মান প্রদর্শন করে। অর্থাৎ সে বিভিন্ন বাহানায় সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

তারপর সে উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলে কিন্তু এখানেও সে বেশীদিন অবস্থান করতে পারল না। কুফার শাসনকর্তা সায়ীদ ইবনুল আস (রাঃ) তাকে এসব কাজ হতে বিরত থাকার জন্য কঠোর ভাষায় হুশিয়ার করে দিলেন। কুফায় অবস্থান করা তার জন্যে ক্ষতির কারণ হতে পারে, তাই সে দামেশকের পথ ধরল।

সে মুসলমান হয়ে মদিনায় অবস্থান কালীন টার্গেট করেছিল, ইসলামী ইমারতের প্রধান প্রধান পাঁচটি মারকাজ আছে, মদিনা, বসরা, কুফা, দামেস্ক, মিশর, এসবগুলোকে সে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তার টার্গেট অনুযায়ী দামেস্কের পথ অতিক্রম করছে। তবে দামেশকে আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) থাকার কারণে সে সুবিধা করতে পারেনি।

তবুও সে দামেশকে উসমান (রাঃ) এর খিলাফ বীজ বপন করে যায়। সেখান থেকে ইবনে সাবা মিশর পৌঁছে। মিশরে সবচেয়ে বেশী কামিয়াব হয়। সেখানে থেকে হযরত উসমান (রাঃ) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চুড়ান্ত করে। সেখানে তার স্বপক্ষে মজবুত ঘাটি তৈয়ার করার সুযোগ পায়। কেননা সেখানের শাসন কর্তা আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ (রাঃ) অধিকাংশ সময় রুমীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। সেজন্য নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ

বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার মত সময় তাঁর হাতে খুব কমই ছিল। এ সুযোগে আব্দুল্লাহ বিন সাবা এখানে বসে সর্বনাশা প্লাণ করে। এখানে বসেই হযরত উসমান (রাঃ) এর বিরোধিতার বীজ গোটা দেশে ছড়িয়ে দেয়। মদিনায় তার যে সকল মুরীদ ছিল, তাদের মাধ্যমে চিঠি লিখিয়ে আলী (রাঃ) এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের নাম দিয়ে বসরা, কুফা, মিশরের ঐ সকল লোকদের কাছে প্রেরণ করা হতো। যে লোকেরা তাদেরকে অত্যাধিক ভালবাসতো। নবী পরিবারের প্রতি যারা দুর্বল ছিল। এসকল চিঠির ভাষ্য ছিল এই যে, হযরত উসমান (রাঃ) শাসন কার্য চালানোর যোগ্যতা রাখেন না। তাঁর কারণে দেশের সর্বত্র অবিচার অনিয়ম চলছে। তাকে শাসন ক্ষমতা হতে সরানো আমাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। তোমাদের সাহায্য অতীব জরুরী। সুতরাং তোমরা আগামী হজ্বের দিনে হযরত উসমান (রাঃ) এর কাজটা সমাধা কর (তাকে হত্যা করো)।
-ইতি আয়েশা ও আলী (রাঃ)।

এ ধরণের চিঠি ইবনে সাবার দলের লোকেরা লিখে লিখে একাধিক বার বসরা, কুফা, মিশরে প্রেরণ করেছিল। এ ধরণের চিঠি যে সকল মুসলমানের কাছে পৌঁছেছিল, তারাও চিঠির শেষে উম্মাহতুল মুমিনীন, আলী, তালহা, যোবাইর (রাঃ) এর নাম দেখে তাদের সাহায্য করার জন্য ইবনে সাবার বাহিনীতে যোগদান করে।

৩৫ হিজরীর শাওয়াল মাসের শুরুতে মিশর হতে এক হাজার মানুষের একটি কাফেলা হজ্বের কথা প্রচার করে রওয়ানা হয়। তবে এক সাথে নয়। চারটি কাফেলায় বিভক্ত হয়ে মিশরের সরহদ ত্যাগ করে। তারপর পূর্ব নির্ধারিত স্থানে সকলে জমায়েত হয়। এ বাহিনীর সরদার ছিল গাফেকী বিন হরব নামে এক কুখ্যাত ব্যক্তি। একই দিনে কুফা হতে

মালেক বিন আশতরের নেতৃত্বে এক হাজার মানুষের এক কাফেলা হজ্বের উদ্দেশ্যে কুফা ত্যাগ করে। তারাও প্রথমে চার ভাগে ভাগ হয়ে কুফার বাহিরে আসে। তারপর নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়।

এমনিভাবে একই তারিখে বসরা হতে হাকিম বিন জাবালার নেতৃত্বে এক হাজার লোকের কাফেলা রওয়ানা হয়। তারপর পথিমধ্যে তিন কাফেলা একত্রিত হয়ে এক সাথে মদিনায় প্রবেশ করে। তখন মদিনার মাটি উসমান (রাঃ) এর জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। যে উসমান (রাঃ) এর রক্তের প্রতিশোধ নিতে স্বয়ং রাসূল (সাঃ) মৃত্যুর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। চৌদ্দশত সাহাবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা যার শানে আয়াত নাযিল করলেন। আজ তাকে মদিনার মসজিদে আসতে বাঁধা প্রদান করা হচ্ছে।

শেষতক তাঁর জন্য মসজিদে নব্বীর দরজা খোলা হল না। তিনি নামাজের দায়িত্ব আবু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) কে অর্পণ করলেন। কিন্তু দুশমনরা তাঁর ইমামতিতেও নামায পড়তে রাজী হল না। ওদের নিজস্ব নেতা গাফেকী বিন হরবকে মসজিদে নব্বীর ইমাম নিযুক্ত করল।

ওরা উসমান গনী (রাঃ) এর জীবনের শেষ নামাজ গুলো মসজিদে নব্বীতে পড়ার সুযোগ দিল না। শুধু তাই নয় দুশমনরা উসমান গনী (রাঃ) এর বাড়ী অবরোধ করল। আলী (রাঃ), তালহা, যোবাইর (রাঃ) প্রমূখ সাহাবীগণ বললেন তোমরা কি চাও? তোমাদের সকল দাবী পূরণ করা হবে। তোমরা অবরোধ তুলে নাও। ওদের এক কথা। আমরা উসমানকে হত্যা করতে চাই।

যে মদিনায় কাফিরদের প্রবেশ নিষেধ। রাসূলের যুগে সম্মিলিত কাফির বাহিনী, চল্লিশ হাজার কাফির বাহিনী যা করতে পারেনি, আজ মুনাফেকরা তাই করছে। খন্দকের যুদ্ধে চল্লিশ হাজার কাফির সম্মিলিত চেষ্টা করেও মদিনায় প্রবেশ করতে পারেনি। আজ মুনাফেকরা সেই মদিনায় প্রবেশ করেছে।

শুধু মদিনায় প্রবেশই করেনি বরং ওরা এক জঘন্য ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছে। ওদের রুখার মত মদিনায় কেউ নেই। সাহাবায়ে কিরাম সকলেই আরাফাতের ময়দানে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলছেন। দুনিয়ার মানুষের খবর ও নেই যে কি হতে যাচ্ছে। চল্লিশ দিন যাবত তাঁর ঘর অবরোধ করে রাখা হয়েছে। চল্লিশ দিন যাবত তাঁর ঘরে কোন খাদ্য পৌঁছতে দেয়া হচ্ছে না। আজ শিয়ারা হায় হুসাইন হায় হুসাইন করে মাতম করে, আর দুঃখ প্রকাশ করে যে তিন দিন পর্যন্ত হুসাইন (রাঃ) এর জন্য পানি বন্ধ ছিল। তিন দিন পর্যন্ত হুসাইন (রাঃ) পানির পিপাসায় কষ্ট করেছেন, কিন্তু যে উসমান (রাঃ) এর ঘরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পানি পৌঁছতে দেয়া হয়নি। সে উসমান (রাঃ) এর কথা শিয়ারা স্মরণ করে না।

তাঁর জন্য তাদের কোন দুঃখ শোক নেই। যে দিন হতে দুশমনরা খলিফার ঘরে পানি নেয়ার রাস্তা ও বন্ধ করে দিল। সেদিন উসমান (রাঃ) মনে মনে খুব ব্যথিত হলেন, মনের অজান্তেই কেঁদে ফেললেন।

নিজেকে শামলে নিয়ে নিজ ঘরের ছাঁদে উঠলেন, দুশমনদের প্রতি লক্ষ করে বললেন, তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে এসেছ? আমি তো তোমাদেরকে হত্যা করতে চাইনি। হত্যার আদেশও দেইনি। তোমারা বলছ, আমি তোমাদেরকে হত্যা করার জন্য মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ

বিন সা'দের কাছে পত্র পাঠিয়েছি। আমি এ পত্র প্রেরণ করিনি। এ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নেই। তোমরা যদি বিশ্বাস না কর তাহলে আমি কসম করেও বলতে পারি যে আমি এ চিঠি সম্বন্ধে জানিনা।

তোমরা কেমনে আমার রক্তকে হালাল মনে করলে! আমি তো কোন দিন কাউকে হত্যা করিনি। আমি কাফির অবস্থায়ও কোন দিন যিনা করিনি। আমি ইসলামের শুরুতে যখন মুসলমান হওয়ার কারণে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করতে হত, সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছি। মুসলমান হওয়ার কারণে কাফির বেদ্বীনের হাতে বহু নির্যাতন ভোগ করেছি। ইসলাম গ্রহণের পর কোন দিন মিথ্যা কথা বলিনি। কোন দিন শরাব পান করিনি। আজ তোমরা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করার মনস্ত করেছ?

হযরত উসমান (রাঃ) এর ভাষণের দ্বারা তাদের মাঝে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, তাদের অনেকেই অর্থ্যাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা এবং তাদের এজেন্ট ছাড়া সকলেই বলল, খলিফার অবরোধ তুলে নেয়া উচিৎ, তাকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক হবে না। সাধারণ লোক যারা এ ঘেরাওয়ের মধ্যে শামিল ছিল, তারা তো হযরত আলী, আয়েশা, তালহা প্রমূখগণের চিঠির ভিত্তিতে এসেছিল। তাঁরা আব্দুল্লাহ বিন সাবার চক্রান্ত বুঝতে সক্ষম হয়নি। ইবনে সাবার নিয়ত হলো ইসলাম ও মুসলমানকে ধ্বংস করা। এ জন্যই তো ইবনে সাবার এজেন্টরা শুধু উসমান (রাঃ) কেই হত্যা করেনি বরং তারপর আলীকেও তারাই হত্যা করেছে। সাধারণ মানুষ একথাও বুঝতে পারেনি যে উসমান (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যে সকল চিঠি তাদের হস্তগত হয়েছে সে সকল চিঠি আলী (রাঃ) বা মদিনার কোন সাহাবী প্রেরণ করেনি। এ সকল চিঠি ইবনে সাবার লোকেরাই লিখেছে।

তাই সাধারণ মানুষ যখন উসমান (রাঃ) এর ভাষণ শুনে নিজ নিজ শহরে চলে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন ইবনে সাবার এজেন্টরা তৎপর হয়ে উঠল।

তারা ভাবল শিকার হাতের কাছে এসেও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই মালেক বিন আশতর নামে এক কুখ্যাত ব্যক্তি সকল লোকজনকে. সম্বোধণ করে বলল,

ভায়েরা আমার! তোমরা উসমানের ভাষণ শুনে ধোকায় পড়বে না। সে জীবন বাঁচানোর জন্য যাই বলুক না কেন আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতেই হবে। মালেক বিন আশতর শান্তি পরিবেশকে আবার অশান্ত করে তুলল। তার উস্কানিতে পিছপা হওয়া লোকেরা খলিফার ঘরের অতি নিকটে পৌঁছে গেল। এ সময় হাসান বিন আলী (রাঃ), মুহাম্মদ বিন তালহা প্রমুখ সাহাবীগণ যারা হযরত উসমান (রাঃ) এর হিফাজতের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের সাথে দুশমনদের খলিফার ঘরের দরজায় মোকাবালা হয়। গুটি কয়েকজন সাহাবীর তীব্র প্রতিরোধে তারা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। মুগিরা ইবনুল আখনাস (রাঃ) এ অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারলেন না। তিনি কয়েকজন সাথী নিয়ে দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে ততক্ষনাৎ শাহাদাত বরণ করেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) ও দুশমনদের উপর আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু উসমান (রাঃ) আবু হুরাইরা (রাঃ), হাসান (রাঃ), হুসাইন (রাঃ) সহ সকলকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলতে ছিলেন, যে তোমরা ওদের সাথে মোকাবালা করো না। তোমরা নিজ নিজ ঘরে চলে যাও, বা আমার ঘরে প্রবেশ কর। খলিফার নির্দেশে সকলে ঘরে প্রবেশ করলে দুশমনরা ঘরের

দরজায় আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ঘরে ঢুকে পড়ে, এ সময় হাসান (রাঃ), মুহাম্মদ বিন তালহা (রাঃ) এবং তাদের সাথীরা মোকাবালা করে তাদের দূরে সরিয়ে দেয় এবং কিছু লোক ছাঁদে, আর কিছু লোক দরজায় দাঁড়িয়ে দুশমনদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এ সময় হযরত উসমান (রাঃ) কোরআন শরীফ পড়তেছিলেন, যখন তিনি নিম্ন বর্ণিত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন [illegible]

অর্থঃ এরা সে সব লোক যারা খবর পরিবেশন করে যে দুশমনরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। এ খবর শোনার পর তাদের ঈমান আরও বেশী মজবুত হয়ে যায় এবং তাঁরা বলে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কার্য সম্পাদনকারী।

উল্লেখিত আয়াত পড়ার পর ঘরে তাঁর সাহায্যে উপস্থিত সাহাবীদের কে লক্ষ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে আমি একটি অঙ্গিকার করেছি, আমি সে অঙ্গিকারের উপর কায়েম আছি। তাই তোমরা এ সকল দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করো না। এ সময় উসমান (রাঃ) এর ঘরের দরজায় হাঙ্গামা শুরু হয়। খলিফার হিফাজতে যে সকল সাহাবী সশস্ত্রাবস্থায় তাঁর কাছে ছিলেন, অবস্থা খারাপ দেখে কিছু লোক ঘরের ছাঁদে ছিলেন, আর কয়েকজন সাহাবী দরজায় দন্ডায়মান ছিলেন, দুশমনরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়ে পিছন দিক দিয়ে দেওয়াল ভেঙ্গে হযরত উসমান (রাঃ) এর কাছে পৌঁছে যায়।

দুশমনদের মধ্যে কেনানা বিন বশীর নামে এক ঘৃণ্য ব্যক্তি সর্ব প্রথম হযরত উসমান (রাঃ)এর উপর তরবারী চালায় ,তাঁর বিবি নায়লা হাতের দ্বারা তরবারীর আঘাত প্রতিহত করেন। এতে তাঁর আঙ্গুল গুলো কেটে যায়।তারপর কেনানা দ্বিতীয় আঘাত করে, এ আঘাতেই খলিফা উসমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করেন। ৩৫ হিজরীর জিলহজ্ব মাসের আঠার তারিখ শুক্রবার দিন ইতিহাসের এক জঘন্যতম অধ্যায় রচনা হয়।

বন্ধুরা আমার ! কেনানা যখন খলিফাকে শহীদ করে ছিল, তখন দুশমনদের সকলেই এক সাথে উসমান(রাঃ) এর ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ঘরের সকল সামানপত্র লুটে নিল, নিত্যদিনের ব্যবহার কাপড় গুলো পর্যন্ত ও নিয়ে নিল । বিদ্যুৎ গতিতে খলিফার শাহাদাতের খবর মদিনার স্বর্বত্র পৌছে গেল । মদিনার অলি-গলি, ঘরে-বাইরে সবস্থানে মাতম শুরু হল, কিন্তু কারো সাহস হল না কিছু করার, কিছু বলার। মদিনার দিক দিগন্ত থেকে ভেসে এল শুধু কান্নার আওয়াজ । শুধু আহাজারী আর রুনাজারী। তিনদিন পর্যন্ত তাঁর লাশ ঘরে পড়ে রইল। জালেমরা তাকে দাফন কাফনের সুযোগ পর্যন্ত দিচ্ছে না। কবর খনন করার সুযোগও দিচ্ছে না। জানাজার নামায পড়ার সুযোগও দিচ্ছে না । মদিনার সর্বত্র ওরাই বিরাজ করছে । চলছে ওদের নিরব নির্যাতন, মদিনার মুসলমানদের কলিজা ফেটে যাচ্ছে , দিল টুকরা টুকরো হয়ে যাচ্ছে, নবী (সাঃ) এর কলিজার টুকরা আজ তিন দিন যাবত বেদাফন পড়ে আছে।

যে খলিফার আদেশে মুসলিম সেনারা আফ্রিকা বিজয় করল, ইস্কান্দারিয়া, আরমেনিয়া, কাবরাজ, রোডাস আজারবাইজান, তবরিস্থান, কাবুল, খোরাসান সহ অসংখ্য দেশ-মহাদেশ, অগণিত দ্বীপ-উপদ্বীপ

বিজয় করল, সে খলিফা আজ মজলুমবস্থায় শহীদ হলেন । মুনাফেকদের হাতে বলি হলেন। যে খলিফা জাহিলিয়াত যুগে ও মানুষের প্রতি রহম দিল ছিলেন । অন্যের অন্য ব্যবস্থা করেছেন যিনি সারাটি জীবন । যার বদান্যতা সর্বজন স্বীকৃতি । যিনি তবুক যুদ্ধের ব্যয়ভারের এক তৃতীয়াংশ নিজের পকেট থেকে দিয়েছেন। জাইসুল উসরা যুদ্ধের সকল সামানের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন।

নবী (সাঃ) এর সংসারের লোকেরা বহুবার খাদ্য সমস্যায় কষ্ট ভোগ করেছেন । নবী পরিবার বহুদিন না খেয়ে দিনাতিপাত করেছেন, দুনিয়ার মানুষ এ দুঃখ-কষ্টের কথা খুব কমই জানত, কিন্তু উসমান (রাঃ) নবী পরিবারের ভিতরের খবর রাখতেন। প্রায় সময় তিনি নবী (সাঃ) এর ঘরে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র প্রেরণ করতেন । রাসূল (সাঃ) তাঁর জন্য দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও ।

খলিফা আবুবকর (রাঃ) এর যুগে এক সময় সাংঘাতিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । সাধারণ মানুষ খাদ্যাভাবে দারুণ কষ্ট পোহায় । এক মুঠি দানা ব্যবস্থা করা দুরহ হয়ে পড়ে । এমন কঠিন মুহূর্ত ছিল যে টাকা মিললেও খাদ্য মিলে না । খাদ্যাভাবে মানুষের করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয় । এ সময় মদিনায় খবর পৌঁছল, হযরত উসমান (রাঃ) এর এক হাজার উটের এক বিরাট কাফেলা বিদেশ থেকে খাদ্য বোঝাই করে, মদিনার অনতিদূরে উপনীত হয়েছে, এ খবর শুনে ছোট ছোট সাধারণ ব্যবসায়ীগণ উসমান (রাঃ) এর বাড়ীতে ভীড় জমালেন এবং সকলেই বলতে ছিলেন আমাকে এত টাকার মাল দিবেন। আমাকে এত টাকার মাল দিবেন । সাধারণ ব্যবসায়ীগণ উসমান (রাঃ) এর কাছ থেকে পণ্য

ক্রয় করে খুচরা বিক্রি করতেন। সাধারণ ব্যবসায়ী যাদের হাতে টাকা ছিল, কেবল তাঁরাই উসমান (রাঃ) দরবারে উপস্থিত হলো । আর যাদের হাতে টাকা নেই, তাদের কোন আশা ভরসা নেই । ওরা সাধারণ মানুষ। ওদের আর কষ্টের সীমা রইল না । এমন মানুষ উসমান (রাঃ) এর দরবারে খুব কমই এল। সাধারণ ব্যবসায়ীগণ বলতে ছিলেন আপনি একশত দেরহামে যে পরিমাণ শষ্য ক্রয় করেছেন, তা আমাদের কাছে দেড়শত টাকা দুইশত টাকা মূল্যে বিক্রি করুন । তবুও আপনার কাছে মাল চাই।

হযরত উসমান (রাঃ) উপস্থিত লোকদেরকে খেতাব করে বললেন, ওহে লোক সকল! তোমরা সাক্ষী থেকো । আমি এ সকল খাদ্য শষ্য মদিনার গরীব মিসকীন এবং সাধারণ মানুষের জন্য দান করে দিলাম । খাদ্য পাওয়ার অগেই মদিনার জনগণের মাঝে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। উসমান (রাঃ) এর দানের খবর শুনেই সাধারণ মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হল । তিনি এ খাদ্য শষ্য সাধারণ মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি সে রাতেই স্বপ্ন যোগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম তিনি নুরের তৈরী এক জোড়া কাপড় পরিধাণ করে তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত পথ অতিক্রম করছেন। আমি দৌঁড়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)! আমার মনটা আপনার সাক্ষাতের জন্য বেকারার। হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি একটু দাঁড়ান! আপনাকে মন ভরে দেখে হৃদয়টা ঠান্ডা করি।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, আমার হাতে সময় নেই। আমাকে জলদী যেতে দাও। উসমান আজকে এক হাজার উট বোঝাই শস্য আল্লাহর রাস্তায় দান করেছেন। আল্লাহ পাক দান কবুল করে জান্নাতের মধ্যে তাঁর জন্য শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এখন তাঁর বিবাহের আক্‌দ হবে। আমি সে বিবাহ অনুষ্ঠানে শরীক হওয়ার জন্য দ্রুত যাচ্ছি। সে উসমান (রাঃ) আজ বেদাফন পড়ে আছে যে উসমান (রাঃ) দুনিয়া হতে জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন, সে উসমান (রাঃ) এর আজ বেহাল অবস্থা। ইবনে সাবার লোকেরা বাজ্যত আলী (রাঃ) এর তরফদারী করে উসমান (রাঃ) কে হত্যা করল। আসলে ইবনে সাবা ইসলাম কে ধ্বংস করার জন্য সূদুর প্রসারী ষড়যন্ত্রে মেতে ছিল। এজন্য সে বাজ্যত আলী (রাঃ) এর পক্ষপাতিত্ব করে উসমান (রাঃ) কে হত্যা করল। এদিকে আলী (রাঃ) কে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারী রূপে প্রচার করল। আজ পর্যন্ত এক শ্রেণীর মানুষ আলী (রাঃ) কে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকারী মনে করে। সত্যিকার ভাবে যদি ইবনে সাবার লোকেরা আলী (রাঃ) এর হামদরদী হতো, তাহলে পরবর্তীতে ওরা আলী (রাঃ) এর বিরোধিতা করত না। আলী (রাঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিত না। তাকে হত্যা করত না। ইবনে সাবার শিষ্যরা বর্তমানে শিয়া নাম ধারণ করেছে, ওরা বাজ্যত আলী (রাঃ), হুসাইন (রাঃ) এর কথা বলে, তাদের তরফদারী করে সকল সাহাবায়ে কিরাম কে কাফির বলে। ওদের মুখে উসমান (রাঃ) এর শাহাদাতের কাহিনী শোনা যায় না। যে উসমান (রাঃ) খোদার কসম করে দুশমনদের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমান করে ছিলেন। যে উসমান (রাঃ) এর ঘরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য পানি পৌঁছতে দেয়া হয়নি। যে উসমান (রাঃ) ৮২

বছরের বৃদ্ধ সাহাবী ছিলেন। যার দাঁড়ি চুল গুলো শুভ্র হয়েছিল। সে বৃদ্ধ সাহাবী মুনাফেকদের হাত হতে শেষ রক্ষা পেলেন না।
বন্দী দিন গুলোতে তিনি সারাক্ষণ কোরআন পড়তেন। কোরআন পড়াবস্থায় তাকে শহীদ করা হলো। বৃদ্ধ খলিফার রক্তে পবিত্র কোরআন রঙ্গীন হল।

দোস্ত! আজ ইবনে সাবার দূসর শিয়ারা উসমান (রাঃ) কে কাফির বলে আমরা যদি এদের কে দমন না করি। এদের কে সমূচিৎ শিক্ষা না দেই। তাহলে পবিত্র কোরআন কাল কিয়ামতে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা করবে। আসুন! আমরা সকলে মিলে কাফির বেদ্বীন এবং মুনাফেক ইবনে সাবার বংশধর তথা শিয়াদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তুলি। প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানের প্রতি সশস্ত্র কাফেলায় শরীক হওয়ার নিমন্ত্রণ রইল।

হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর

হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ইসলামের শত্রুরা মাথাচড়া দিয়ে উঠেছিল। রোম সম্রাট শাম সিমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে মদিনা আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছিল। ইয়াহুদীরা মুসলমানদের গোপন তথ্য, তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে রোম সম্রাট ও ইরানীদের কে মুসলিম ভূখন্ডে আক্রমণ করার জন্যে উদ্ধদ্ব করতেছিল। এদিকে কয়েকজন নবুওয়াতর দাবী করে বসল। তলিহা, মুসাইলামা এবং আসওয়াদে আনাসী হুজুর (সাঃ) এর যুগেই নবুওয়াতের দাবী করে। সাজাহ ও

লকিত বিন মালেক হুজুর (সাঃ) এর অবর্তমানে নবুওয়াতের দাবী করে। (সাজাহ একজন মহিলা)। আসওয়াদে আনসী কে হুজুর (সাঃ) এর যুগেই হত্যা করে নবুওয়াতের স্বাদ মিটিয়ে দেয়া হয়। তলিহা নজদ নামক স্থানে নিজের সৈন্য ক্যাম্প স্থাপন করে। গাতফান, হাওয়াজেন বনু আমের সহ বহু ইয়াহুদী খৃষ্টান তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

বনু তাগাল্লুব গোত্রের সাজাহ নাম্নী এক মহিলা নবুওয়াতের দাবী করে। বনু তাগাল্লুব, বনু আমর, বনু শাইবান গোত্রের লোকেরা এবং অনেক খৃষ্টান তাকে নবী রুপে গ্রহণ করে। সাজাহ নাম্নী মিথ্যা নবী চার হাজার সশস্ত্র বাহিনী তৈয়ার করে মদিনায় আক্রমণ করার মানসে যাত্রা শুরু করে। এদিকে এমামা নামক স্থানে মুসাইলামাতুল কাজ্জাব নামে এক ব্যক্তি হুজুর (সাঃ) এর যুগে নবুওয়াত দাবী করে, সে হুজুর (সাঃ) কে পত্র মারফত জানাল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনি যেমন নবী আমিও তেমন একজন নবী! আপনি হলেন অর্ধ জাহানের নবী আর আমি হলাম বাকী অর্ধ জাহানের নবী। হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর সে সমগ্র জাহানের নবী হওয়ার দাবী করে বসল। নিজের নবুওয়াত কে সুদৃঢ় করার জন্যে চল্লিশ হাজার লোকের এক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করল এবং সে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যে এ বাহিনী সবচেয়ে বেশী খতরনাক ছিল।

মিথ্যা নবীদের মধ্যে আরেকজন হল লকিত, সে উমান দেশের নিবাসী। হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে সে নবুওয়াতের দাবী করে। উমান দেশের জনগণ এবং মহরা বাসী তাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করে। এছাড়াও হুজুর (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ হওয়ার হিরিক পড়ে যায়। অনেক গোত্র যাকাত অস্বীকার করে বসে। বাহরাইন দেশের বহু

লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে। তারা হাতাম বিন জনিয়াকে সরদার নিযুক্ত করে এবং সাধারণ মুসলমানের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায় যেন সমগ্র বাহরাইন বাসী মুরতাদ হয়ে যায়। হুজুর (সাঃ) এর তিরোধানের পর মহরা নামক এলাকার বাসিন্দারা ও মুরতাদ হয়ে যায়। মসীহ নামক এক কুখ্যাত ব্যক্তি এ সমল মুরতাদদের নেতৃত্ব প্রদান করে।

হুজুর (সাঃ) এর অবর্তমানে এমান দেশের জনগনের মধ্যেও ধর্ম ত্যাগ করার সাড়া পড়ে যায়। কায়েস বিন মাকশুহ ও আমর বিন মাআদিকারাবা মুরতাদদের পক্ষে সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারা সাধারণ মুসলমানের উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করে, এবং নাজরান নামক স্থানে মজবুত সেনা ঘাটি স্থাপন করে। শুধু তাই নয় হাজরা মাউতবাসী ও সানা দেশের লোকেরা এবং বনু কাজা ও বনুসালীম গোত্রের লোকেরা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

অর্থাৎ মক্কা, মদিনা ও তায়েফ ছাড়া সমগ্র মুসলিম বিশ্বে মুরতাদ হওয়ার ডাক পড়ে যায়। প্রতিদিন মদিনায় মুরতাদ হওয়ার সংবাদ আসতে থাকে। এ দুঃসংবাদ এত অধিক পরিমাণে মদিনায় আসতে থাকে যে সাহাবায়ে কিরামের মন সাময়িক সময়ের জন্য হলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। এক দিকে হুজুর (সাঃ) এর বিচ্ছেদ বেদনা, অপর দিকে ইসলামের বিরুদ্ধে হরতরফ হতে বুলন্দ আওয়াজ উঠায়, তাঁরা সামনের রাস্তা অন্ধকার দেখতে পায়। এ কঠিন মুহূর্তে মুসলিম খলিফা আবুবকর (রাঃ) উসামা (রাঃ) এর সেনাপতিত্বে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করার ইচ্ছা করলেন এবং সকল মুরতাদদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার মনস্ত করলেন। এ সময় ওমর (রাঃ) সহ প্রায় সকল সাহাবায়ে কিরামগণ বলতে ছিলেন,

ওহে আমিরুল মুমিনীন! আপনি হেকমতের সাথে কাজ নেয়ার চেষ্টা করেন। ইসলামী রাষ্ট্রের এ দুর্গতি ওয়াক্তে রোমানদের বিরুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করা ঠিক হবে না। এমনিভাবে মুরতাদদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে না যেয়ে আলোচনার মাধ্যমে সামনে অগ্রসর হওয়া উচিৎ। নচেৎ ইসলামী রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষতি সাধন হবে। ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মদিনা দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত হবে। অনেক সাহাবায়ে কিরাম সামরিক অভিযান চালানোর বিপক্ষে মত পোষণ করলেন। ওমর (রাঃ) এর মত ব্যক্তি ও আবুবকর (রাঃ) এর চিন্তা ধারার সাথে একমত হলেন না।

বন্ধুরা আমার! এ মুহূর্তে আবুবকর (রাঃ) দ্বীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন আমি বাঁচব দ্বীনের জন্য, আমি মরব দ্বীনের জন্য, আমার মান সম্মান সবই দ্বীনের জন্য। খোদার কসম! দ্বীনের সামান্য ক্ষতি হবে তা বরদাশত করব না। তোমরা যুদ্ধ কর কিংবা না কর, আমি একাই কাফির বেদ্বীন ও মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বুকে আত্মার স্পন্দন বাকী থাকবে, ওদের শায়েস্তা করতে পিছপা হব না। হে ওমর! তুমি যখন কুফুরের সাগরে ডুবতেছিলে, (অর্থাৎ যখন তুমি কাফির ছিলে) তখন তুমি বাহাদুর ছিলে। ইসলামে প্রবেশ করে তুমি বুঝি বুঝদিল হয়ে পড়লে।

অর্থঃ হে ওমর! দ্বীনের সামান্য ক্ষতি হবে আর আমি বেঁচে থাকবো! এটা হতে পারে না। দোস্ত! আবুবকর (রাঃ) এর ঈমানী শক্তি দেখো! তাঁর আত্মিক মনোবল দেখো! তাঁর শাজাআত দেখো! তাঁর ইস্তেকামাত দেখো! সবাই এক দিকে, তিনি একাই অন্যদিকে। সবাই যুদ্ধ এড়িয়ে চলার পক্ষে। তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে। আবুবকর (রাঃ)

সাহাবাগণকে সম্বোধণ করে বললেন। তোমরা আমাকে মদিনা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দিচ্ছ। শুনে রেখো! আমাকে যদি একথার গ্যারান্টি দেয়া হয় যে লশকরে উসামা সিরিয়ায় প্রেরণ করার পর দুশমনরা মদিনায় আক্রমণ চালাবে। মদিনার মসজিদ ধ্বংস করবে। ইসলামী ইমারতের রাজধানী ধ্বংস করবে। হুজুর (সাঃ) এর বিবিদের ইজ্জতের বেহুরমতি হবে, দুশমনরা-হিংস্র জানোয়াররা মদিনায় আমাকে একা পেয়ে কতল করে দিবে, তবুও আমি হুজুর (সাঃ) এর প্রেরিত বাহিনী লশকরে উসামার অভিযান কে মুলতুবি করব না। তোমরা বলছ যাকাত অস্বীকার কারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিহার করে হেকমতের সাথে কাজ নিতে। হেকমতের অর্থ কি যুদ্ধ বন্ধ করা? কখনো যুদ্ধ বন্ধ রাখা হবেনা। হেকমতের অর্থ হল যুদ্ধের ময়দানে দুশমনের সামনে নিজেদেরকে শক্তিশালী রূপে পেশ করা। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দুশমনের বেশী ক্ষতি করা। ওরা যাকাত দিতে অস্বীকার জানিয়েছে, খোদার কসম! যাকাত কেন? যাকাতের একটা বকরী, যাকাতের একটা রশ্মি, বা যাকাতের একটা দানাও যদি দিতে ওরা অস্বীকার করে, তবুও আমি ওদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাব।

আবু বকর (রাঃ) এর উক্ত ভাষণের পর সকল সাহাবায়ে কিরাম তাঁর সাথে একমত হলো। বুখারী শরীফে আছে ওমর (রাঃ) বলেন আল্লাহ পাক আমার অন্তর দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন। আবুবকর (রাঃ) এর সিদ্ধান্তই সঠিক। তারপর হযরত আবুবকর (রাঃ) ১৭ বছর বয়সের সেনাপতি উসামা (রাঃ) কে তাঁর বাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলেন। তাঁরা কিছু রাস্তা অতিক্রম করার পর সেনাপতির মনে একটি সন্দেহ হলো যে, সকল বড় বড় বাহাদুর সাহাবীগণ আমার এ কাফেলায়

শামিল হয়েছেন। এ সুযোগে ইসলামের দুশমনরা যদি মদিনায় আক্রমণ করে বসে, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তিনি সফর বিরতি করে ওমর (রাঃ) এর মাধ্যমে খলিফার কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করলেন। যার ভাষা নিম্নরূপঃ-

খলিফাতুল মুসলিমীন!

আমার ভয় হচ্ছে, মদিনার বড় বড় সাহাবীগণ সকলেই আমার সাথে রয়েছে, এ সুযোগে দুশমনরা মদিনায় আক্রমণ করতে পারে, তাই আপনি প্রবীন সাহাবীগণকে মদিনায় রাখুন! হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেনাপতির সংবাদ নিয়ে যাত্রা করলেন, তখন আনসার সাহাবীগণ ও তাঁর মাধ্যমে খলিফার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন, যে পত্রে লেখা ছিল,

খলিফাতুল মুসলিমীন! উসামা (রাঃ) হলো একজন কম বয়সী ছেলে, তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর , সুতরাং আপনি একজন মধ্য বয়সী লোক কে কমান্ডার নিযুক্ত করুন।

হযরত ওমর (রাঃ) মদিনায় এসে সর্ব প্রথম সেনাপতির পত্র খলিফার কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি পত্র পড়ে বলে উঠলেন, যদি মদিনায় সকল বস্তি জনশূণ্য হয়ে যায়, আমি শুধু একা বেঁচে থাকি, আর কোন দানব এসে আমাকে গিলে ফেলে তবুও আমি কোন মুজাহিদকে জিহাদের কাফেলা হতে রুখে রাখব না। তারপর ওমর (রাঃ) আনসারগণের পত্র হস্তান্তর করলেন, খলিফা আনসারীদের পত্র পড়ে তাঁদের প্রতি একটু বেজারী প্রকাশ করলেন, তারপর নিজেই পদব্রজে মদিনার বাহিরে এসে উসামা (রাঃ) এর বাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হযরত উসামা (রাঃ) কে যাত্রা পূন শুরু করার নির্দেশ দিলেন। লশকরে

উসামা চলছে আর খলিফা উসামার ঘোড়ার জ্বীন ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন। খলিফা দিক নির্দেশনা মূলক অনেক কথাই তাঁকে বলছেন। উসামা (রাঃ) বললেন, আমিরুল মুমেনীন। আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হোন, না হয় আমি ঘোড়া হতে নেমে পড়লাম। খলিফা আবুবকর (রাঃ) বললেন, তোমার নামার প্রয়োজন নেই। আমার সওয়ার হওয়ার ও প্রয়োজন নেই। তিনি ঘোড়ার জ্বীন ধরে দীর্ঘপথ এগিয়ে চললেন, খলিফার এহেন তাওয়াজু দেখে সাধারণ সৈনিকদের মন ভরে গেল। তাঁরা মনে প্রাণে খলিফার নির্দেশ মানার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হল। খলিফা এ সময় সেনাপতিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করেন, যা আমাদের জানা থাকা জরুরী।

সেনাপতিকে খলিফার নসিহত

হযরত আবুবকর (রাঃ) উসামাকে বিদায় দেয়ার সময় সর্বশেষ কয়েকটি নসিহত করেন। (১) যুদ্ধের ময়দানে খিয়ানত করো না (২) মিথ্যা বলো না। (৩) অঙ্গিকার ভঙ্গ করো না (৪) বাচ্চা, বৃদ্ধ ও নারীদেরকে হত্যা করো না (৫) ফলদার গাছ ও শয্যের ক্ষতি করো না। (৬) খাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সওয়ারী উট জবাই করো না। (৭) খানা সামনে আসলে আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করবে। (৮) আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে কাফিরদের সাথে লড়াই করো। (৯) ইসলামের প্রতি মানুষ কে নরম ভাষায় দাওয়াত দিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

হযরত আবুবকর (রাঃ) হরফ নামক স্থানে তাদের বিদায় দিয়ে মদিনার পথ ধরলেন, সে মুহুর্তে খলিফা আবুবকর (রাঃ) সেনাপতির কাছে ওমর (রাঃ) কে মদিনায় রেখে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, উসামা

(রাঃ) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন। চিন্তা করার বিষয়, খলিফা ইচছা করলে নিজ হুকুমে ওমর (রাঃ) কে মদিনায় রাখতে পারতেন, তিনি তা না করে সেনাপতির কাছে অনুমতি চাইলেন, খলিফা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন; যে জিহাদের ময়দানে আমীরের এতাআত জরুরী। খলিফা ওমর (রাঃ) কে নিয়ে মদিনায় ফিরে এসে, মক্কা মদিনার নওজোয়ানদেরকে মসজিদে নববীর সামনে একত্র হওয়ার নির্দেশ দিলেন ।

খলিফা নিজ হাতে ১১টি ঝান্ডা তৈয়ার করলেন; এগুলো হলো দ্বীনের ঝান্ডা, জিহাদের ঝাণ্ডা। এগারজন কমান্ডার বাছাই করলেন, যারা প্রবীণ ছিলেন। ছিলেন রণকৌশলী । যুদ্ধের ময়দানে যারা দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন । নিম্নে তাদের মোবারক নাম গুলো উল্যেখ করা হলো, (১) বীর শ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) (২) ইকরামা বিন আবু জাহল (৩) সুরাহবিল বিন হাসানা (৪) খালিদ বিন সায়ীদ (রাঃ) (৫) আমর ইবনুল আস (রাঃ) (৬) হোজাইফা বিন মুহ্সিন (রাঃ) (৭)আরফাজা বিন হারছামা, (৮) তরিফা বিন আজেব (৯) সবিদ বিন মুকরিন, (১০) আলাইবনুল হাজরমী (১১) মুহাজির বিন আবি ইমাইয়্যা।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ১১টি ঝাণ্ডা পূর্বেই তৈয়ার করে ছিলেন, এবার ১১জন কমাণ্ডার নিযুক্ত করে, প্রত্যেকের সাথে এক দস্তা ফৌজ দিয়ে দুশমনের মোকাবালায় প্রেরণ করলেন।

মুরতাদদের বিরুদ্ধে বাহিনী পাঠানোর পূর্বে আবুবকর (রাঃ) এর ফরমান

হযরত আবুবকর (রাঃ) সেনাপতিদের সম্পর্কে একটি ফরমান জারী করেন । এ ফরমান নামা ১১টি কপি করে ১১ জন সেনাপতির কাছে হস্তান্তর করেন । ফরমান নামায় লেখা ছিল হে মুসলিম সেনাপতিরা! (১) প্রতিপক্ষকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে, যদি তারা কবুল করে, তাহলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর যদি তারা ইসলাম কবুল না করে তাহলে তাদের উপর আক্রমণ করবে । আল্লাহ তাআলা মুসলমানগণকে ওদের উপর জয়ী করবেন । তখন তোমরা গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ মদিনায় প্রেরণ করবে, আর বাকীটুকু মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দিবে । (২) দলের সেনাপতি সর্বাবস্থায় সতর্ক থাকবে, নিজ দলে যাতে ফাসাদ হাঙ্গামা সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ রাখবে । (৩) কোন অপরিচিত লোককে নিজ দলে অবস্থান করার অনুমতি দিবে না, তাহলে গুপ্তচর হতে হিফাজত থাকবে। (৪) সাধারণ সিপাহীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে । চলাফেরা কথা-বার্তায় সব সময় দলের মুজাহিদ ও এলাকার সাধারণ মুসলমানদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে।

আবুবকর (রাঃ) এর পয়গাম

আবুবকর (রাঃ) মুসলিম সেনা পাঠানোর পূর্বেই প্রত্যেক মুরতাদ কবিলার কাছে দূতের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করেন, দূতের প্রতি

খলিফার নির্দেশ ছিল যে সকল কবিলার লোকজনকে একত্রিত করে এ পয়গাম পড়ে শুনাবে।

রাসূল (সাঃ) এর খলিফা আবুবকরের পক্ষ হতে ঐ সকল লোকদের কাছে, যারা ইসলাম হতে সরে দাঁড়িয়েছে এবং ঐ সকল লোকদের কাছে ও যারা ইসলামের উপর কায়েম আছে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ) কে সত্য নবী রূপে প্রেরণ করেছেন। যিনি মানুষ কে আল্লাহর পথে আহবান করতেন। যারা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে ছিলেন তাঁরা কামিয়াব হয়েছেন। আর যারা তাঁর বিরোধিতা করে ছিল তাদেরকে জিহাদের মাধ্যমে শায়েস্তা করেছেন। তিনি আল্লাহর আইন দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দ্বীনের কাজ সঠিক রূপে আঞ্জাম দেয়ার পর, তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন। একথা আল্লাহ পাক কোরআনে ঘোষণা করেছেন। انك ميت وانهم ميتون

অর্থঃ তুমি ও মরবে ওরাও মরবে।

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افاين مات او قتل انقلبتم على اعقابكم

অর্থঃ মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু মাত্র আল্লাহর রাসূল। তাঁর পূর্বে বহুত রাসূল এ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন, সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা শহীদ হয়ে যান তাহলে কি তোমরা পূর্বের দ্বীন তথা কুফুরের দিকে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি কুফুরের দিকে ফিরে যাবে সে আল্লাহ তাআলাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ) এর পূজা করত তাঁর জানা উচিৎ যে তিনি বিদায় নিয়েছেন। আর যে এক আল্লাহর উপসনা করত তাঁর এ কথা অবশ্যই জানা আছে যে আল্লাহ জীবিত আছেন এবং থাকবেন। তিনি ঘুমান না। ঝিমান না। তাঁর মৃত্যু

নেই। তিনি তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করেন। তিনি নিজ দলের লোক দ্বারা দুশমনকে পরাস্ত করেন। আমি তোমাদের কে নসিহত করতেছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নবী (সাঃ) এর আনীত ধর্ম মোতাবেক জীবন গড়। দ্বীনে এলাহীর রশ্মি মজবুত করে ধর।

আমার কাছে খবর এসেছে, তোমাদের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর খোদার দ্বীন থেকে মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শয়তানের অনুস্বরণ করছে। তোমরা আল্লাহ কে ছেড়ে শয়তানকে কেন দোস্ত বানালে? সে তো তোমাদের দুশমন। আল্লাহ পাক নিজেই বলেছেন শয়তান তোমাদের দুশমন, সুতরাং তোমরাও শয়তানকে দুশমন মনে কর। কেননা সে তোমাদের কে দোযখের দিকে আহবান করে। আমি মুজাহিদ বাহিনী তোমাদের কাছে পাঠালাম, তোমরা ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল কর, তোমাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা হবে, কোন ক্ষতি করা হবে না। ইসলাম কবুল না করলে, মুজাহিদ বাহিনী তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তখন তোমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা হবে না। মুজাহিদ বাহিনী যখন আযান দিবে, তখন তোমরাও আজান দিবে, তাহলে তোমাদের কে মুসলমান মনে করা হবে।

হযরত আবুবকর (রাঃ) ১১টি পতাকা ১১জন সেনাপতির হাতে তুলে দিলেন।

হযরত খালিদ(রাঃ) এর হাতে প্রথম ঝান্ডা দিয়ে তলিহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, তলিহার অভিযান শেষ করার পর তাঁর প্রতি

নির্দেশ ছিল বাতাআ নামক স্থানে গিয়ে মালেক বিন নবিরা কে হত্যা করা এবং সাজাহ নাম্নী মহিলা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

দ্বিতীয় ঝান্ডা হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রাঃ) এর হাতে দিয়ে এমামা দেশে প্রেরণ করেন, মুসাইলামার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্য। তৃতীয় ঝান্ডা শুরাহবিল কে প্রদান করে হাজারা মাউতের দিকে প্রেরণ করেন।

চতুর্থ ঝান্ডা খালিদ বিন সায়ীদ কে প্রদান করে সিরিয়ার সিমান্তে প্রেরণ করেন।

পঞ্চম ঝান্ডা আমর ইবনুল আস কে প্রদান করে বনু কাজাআর মুরতাদদের বিরুদ্ধে পাঠান।

যষ্ট ঝান্ডা হোজাইফা বিন মুহসিনের হাতে দিয়ে উমান দেশে প্রেরণ করেন।

সপ্তম ঝান্ডা আরফাজার হাতে দিয়ে আহলে মহরায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অষ্টম পতাকা তরিফার হাতে প্রদান করে বনু সালেম ও বনু হাওয়াজেনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

নবম পতাকা সবিদ কে প্রদান করে এমানে যাওয়র নির্দেশ দিলেন।

দশম পতাকা আলা ইবনুল হাজারমীকে প্রদান করেন এবং তাকে বাহরাইন দেশে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন।

একাদশ পতাকা মুহাজির বিন আবি উমাইয়্যা কে প্রদান করেন এবং তাঁকে সানার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

১১তম হিজরীর জমাদিউল আউয়ালের সম্ভবত ১১ তারিখে ১১ জন সেনাপতির নেতৃত্বে ১১টি বাহিনী ১১ দিকে যাত্রা করেন। হযরত

আবুবকর (রাঃ) তাদের বিদায় করে কিছু সংখ্যক নওজোয়ানকে সশস্ত্রবস্থায় মসজিদে নববীর সামনে মোতায়েন করেন। তাঁরা মূলত রিজার্ভ বাহিনী ছিলেন। তাদের কাজ ছিল মদিনার উপর কোন অতর্কিত আক্রমণ আসলে তা প্রতিহত করা।

হযরত আলী (রাঃ), যোবাইর (রাঃ), তালহা (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ), খলিফা এ প্রবীণ চারজন সাহাবী কে গোয়েন্দাগীরীর কাজে নিযুক্ত করেন। তাঁরা তেজী ঘোড়ায় চেঁপে দ্রুত মদিনার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে চক্কর লাগাতেন। মদিনার সিমান্তে পাহারা দিতেন, কোন আগ্রাসী শক্তিকে মদিনার দিকে অগ্রসর হতে দেখলে দ্রুত এ খবর খলিফার কাছে পৌঁছে দিতেন। যদিও তাঁরা গোয়েন্দা গীরীর দায়িত্বে ছিলেন, তবু সাথে সাথে কমান্ডো বাহিনীর দায়িত্বও পালন করেন।

আবরাক ও জিলকচ্ছা নামক স্থানের মুরতাদরা যখন জানতে পারল যে মদিনায় পর্যাপ্ত সৈন্য নেই, তখন তারা মদিনায় আক্রমণ করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। তাদের অগ্রাভিযান আলী (রাঃ) সহ সিমান্ত প্রহরীগণ প্রতিহত করেন এবং দ্রুত এ সংবাদ খলিফার কাছে পৌঁছে দিলেন। খলিফা এ সংবাদ পেয়ে রিজার্ভ বাহিনীকে আলী (রাঃ) এর সাহায্যে প্রেরণ করেন। এ রিজার্ভ বাহিনীর হামলায় মুরতাদরা পালিয়ে গিয়ে একটি কৌশল অবলম্বন করল, ওরা অন্য রাস্তা ধরে ঢোল পিটিয়ে এবং নানা ধরণের বাদ্য বাজিয়ে মুজাহিদগণের দিকে অগ্রসর হয়। এ বাজনার আওয়াজ শুনে মুজাহিদগণের উঠ ঘোড়া গুলো এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। জানোয়ার গুলোর মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ল, ওদেরকে স্থির রাখা সম্ভব হলনা। জানোয়ার গুলো ভয়ে দৌঁড়ে মদিনায় এসে থামল। এ অবস্থা দেখে খোদ খলিফা মদিনার বাহিরে তাশরিফ

এনে যুদ্ধের গতি পাল্টিয়ে দিলন। ৫/৬ ঘন্টা অবিরাম লড়াই করার পর দুশমন পরাজিত হল। বহুত মুরতাদ মুসলমানদের হাতে নিহত হল। খলিফা মদিনার বাহিরে আসার পর মুরতাদদের অন্য একটি জামাত মদিনার কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করে বসল, এতে কয়েকজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন।

খলিফা আবুবকর(রাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করার পর এ অবাঞ্চিৎ ঘটনা শুনে যার পর নাই ব্যথিত হলেন। তিনি আল্লাহর কসম করে বললেন, যে পরিমাণ মুসলমান মুরতাদদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিমাণ মুরতাদ হত্যা করতে না পারব আমি বিশ্রাম করব না। আমার কোন নিস্তার নেই। মুসলমানের রক্তে রঙিন হবে মুরতাদদের হাত আর এর প্রতিশোধ নেব না, তা অসম্ভব। এর পর হতে আবুবকর (রাঃ) আরও বেশী পেরেশান হয়ে পড়লেন। তাঁর কোন ঘুম নেই, তাঁর কোন আরাম নেই, তাঁর কোন খাওয়া নেই। তাঁর কলিজায় আগুন জ্বলে উঠেছে। তিনি ভাবলেন আজ হুজুর (সাঃ) বেঁচে নেই। দুশমনরা নবীর শহরে প্রবেশ করার সাহস পেল। শুধু তাই না, ওরা কয়েকজন মুসলমান শহীদ করে ফেলল। হুজুর (সাঃ) বেঁচে থাকলে অবশ্যই ওদের কে হত্যা করতেন, ওদের এলাকা দখল করে মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

আজ এ দায়িত্ব আমার। কেমনে আমি শান্তিতে থাকতে পারি। ওদেরকে অবশ্যই হত্যা করব। আল্লাহ পাক যদি রহমত করেন, তাহলে ওদের এলাকা দখল করে মুজাহিদগণের মাঝে ভাগ করে দিব। ইত্যবসরে উসামা (রাঃ) এর বাহিনী খৃষ্টানদেরকে পরাজিত করে প্রচুর মালে গণিমত সঙ্গে নিয়ে বিজয়ী বেসে মদিনায় প্রবেশ করেন। আবুবকর

(রাঃ) উসামাকে মদিনায় অবস্থান করার নির্দেশ দিয়ে, নিজে ছোট একটি বাহিনী নিয়ে দুশমনদের এলাকায় পৌঁছলেন। সেখানে মুরতাদদের সাথে ভীষণ লড়াই হল। শেষতক মুরতাদরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। আবুবকর (রাঃ) মুরতাদদের কতল করে মুসলমানের রক্তের প্রতিশোধ নিলেন।

আল্লাহ পাক আবুবকর (রাঃ) এর কসম পূর্ণ করলেন। আবুবকর (রঃ) এর দিল ঠান্ডা হল। চক্ষু শীতল হল। তিনি মুরতাদদের ঘরবাড়ী, ফসলি ভূমি মুজাহিদগণের মাঝে ভাগ করে দিলেন। আর বিশাল খোলা ময়দান মুজাহিদগণের ঘোড়া চড়ানোর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

১১ বাহিনী ১১ দেশে প্রেরণ।

খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রথম ঝান্ডা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর হাতে তুলে দিয়ে তলিহার বিরুদ্ধে পাঠালেন, বাজ্জাখা নামক স্থানে তলিহা বাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের এক প্রান্তে তলিহা চাদর গায়ে দিয়ে অহীর অপেক্ষায় মোরাকাবায় বসেছিল, মানুষ কে ধোকা দেয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। যুদ্ধের ময়দানে তলিহা বাহিনী কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন হলো, এমন সময় তলিহার গ্রুপ কমান্ডার উয়াইনা বিন হাসান তলিহার কাছে প্রশ্ন করল, কোন অহী নাযিল হয়েছে কি-না? তলিহা নীতিবাচক জবাব দিল। কিছুক্ষণ পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করল কোন অহী নাযিল হয়েছে কি-না? এবার ও পুর্বের ন্যায় জবাব পেল। উয়াইনা ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। ইত্যবসরে মুসলিম বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ করে বসল, মুরতাদরা পিছপা হতে লাগল। উয়াইনা আবার তলিহার

কাছে জিজ্ঞাসা করল, তলিহা বলল জিব্রাঈল এসে আমাকে বলে গেলেন, তোমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। উয়াইনা একথা শুনে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, তোমরা কার জন্যে যুদ্ধ করছ, তলিহা মিথ্যা নবী। আমি ময়দান ছেড়ে চলে গেলাম। একথা শোনা মাত্র সমস্ত শত্র সৈন্য ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল। অনেক মুরতাদ নিহত হল, গ্রেফতার হল প্রচুর। ততক্ষণাৎ অনেকেই কালেমা পড়ে মুসলমান হল। তলিহা পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। হযরত ওমর (রাঃ) এর যুগে সেও মুসলমান হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রাঃ) এর বাহিনী তলিহাকে নবী হওয়ার স্বাদ মিটানোর পর সাজাহ নাম্মী নবীর দিকে রওয়ানা হলেন। খালিদ (রাঃ) এর ভয়ে মোকাবালা হওয়ার পূর্বেই সাজাহ্ বাহিনী এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেল। তারপর তিনি বাতাআ নামক স্থানে যান সেখানে মালেক বিন নবিরা সহ বহু মুরতাদকে হত্যা করেন। এ সকল অভিযান পরিচালনা করে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

হযরত ইকরামা (রাঃ) কে এমামা নামক স্থানে মুসাইলামার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি স্বল্প সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে ৪০ হাজার শত্রু সেনার উপর আক্রমণ করে বসলেন। মুজাহিদ সংখ্যা স্বল্প হওয়ার কারণে ইকরামা (রাঃ) এর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। তাই তিনি পিছন দিকে সরে এলেন। ইকরামা (রাঃ) এর পিছটানের খবর মদিনায় পৌছলে, আবুবকর (রাঃ) দ্রুত সংবাদ পাঠালেন। ইকরামা! তুমি মদিনায় ফিরে এসো না। তোমার বাহিনী নিয়ে হোজাইফা (রাঃ) ও আরফাজা (রাঃ) এর সাহায্যে এমান চলে যাও। সেখানে গিয়ে আহলে মহরা ও উমানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

উমানীদের শায়েস্তা করার পর তুমি মুহাজির বিন আবি উমাইয়্যার সাহায্যে এমান চলে যাও।

এদিকে খলিফা মুসাইলামাকে শায়েস্তা করার জন্যে খালিদ (রাঃ) কে বাছাই করলেন। সদ্য ফিরে আসা খালিদ (রাঃ) এর বাহিনী ও উসামা (রাঃ) এর বাহিনী থেকে অতীত যুদ্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তের হাজার মুজাহিদকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে এমামায় প্রেরণ করেন।

খালিদ (রাঃ) এর বাহিনী বীর বিক্রমে আল্লাহ আকবর তাকবীর ধ্বনী তুলে দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এটা খুব কঠিন যুদ্ধ ছিল। মুসলমানদের প্রচন্ড আক্রমণে দুশমনরা এক প্রাচীর ঘেরা বাগানে আশ্রয় নিল, (মুসাইলামা সেই বাগান কে হাদিকাতুর রাহমান বলে নামকরণ করেছিল)। এ সময় দুশমনদের পক্ষ হতে জবাবী আক্রমণে মুসলমানদের পতাকাবাহী কমান্ডার ছাবেত বিন কায়েস (রাঃ) শহীদ হলেন। যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ) পতাকা সামলে নিলেন। মুসলমানগণ নিজ ভায়ের রক্ত ঝরতে দেখে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

এক নিমিষে প্রাচীর ভেঙ্গে মুসলমানগণ ভিতরে প্রবেশ করলেন। মুসাইলামা প্রতিকুল পরিস্থিতি দেখে আত্মরক্ষার জন্য পিছনের দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে অহশী (রাঃ) দুকদম অগ্রসর হয়ে জোর হাতে বর্যা নিক্ষেপ করলেন, খোদার দুশমনের পেট ভেদ করে অন্য পাশ দিয়ে বের হল। এসময়ে তিনি একটি কবিতা আবৃতি করলেন

অর্থঃ যখন আমি কাফির ছিলাম তখন সর্বশ্রেষ্ট মানব হামজা (রাঃ) কে

হত্যা করেছি। আর ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানবকে হত্যা করলাম। সামান্য সময়ের মধ্যে ময়দানে দুশমনের লাশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। এ যুদ্ধে ১৭ হাজার দুশমন মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। এক সহস্রাধিক মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মধ্যে অনেক হাফেজে কোরআন ও শহীদ হন। ১১ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে এ যুদ্ধ খতম হয়।

উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, খলিফা আলা ইবনুল হাজারমীকে বাহরাইনে প্রেরণ করে ছিলেন। বাহরাইনের মুরতাদরা আতিক নামক স্থানের কাছাকাছি মজবুত ঘাটি নির্মাণ করেছিল, মুসলিম সেনাদলের আগমণ বার্তা শুনে দুশমনরা তাদের ঘাটির চারদিকে খন্দক খনন করে। মুসলিম বাহিনী বাহরাইনে প্রবেশ করে দুশমনদের কাছে তাবু ফেলে। এক দু'দিন পরই যুদ্ধ বেঁধে যায়। একমাস পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে, জয় পরাজয়ের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সবশেযে মুসলিম সেনাপতি একদিন নিজ বাহিনী নিয়ে সর্বাত্মক হামলা চালালেন, খন্দক পেরিয়ে দুশমনের ঘাটিতে পৌঁছে গেলেন। প্রতিপক্ষের সেনাপতি হাতাম সহ বহু সংখ্যক মুরতাদ নিহত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে এত অধিক পরিমাণ গণিমতের মাল আসে যে তাদের পক্ষে আরও দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

উপরে উল্যেখ করা হয়েছে যে, লকিত নামী মিথ্যা নবীর বিরুদ্ধে খলিফা আবুবকর (রাঃ) হোজাইফা (রাঃ) কে উমানে প্রেরণ করেছিলেন। হোজাইফা (রাঃ) উমান পৌঁছে দুশমনের মোখামুখি হলেন। এমন সময় এমামা হতে ইকরামা (রাঃ) এর বাহিনী তাঁর সাহায্যে যোগ দিল। দাবা নামক শহরে লকিত সৈন্য সমাবেশ করল। মুসলমানগণ

তাদের তুলনায় একটু নীচু জমিনে সৈন্য বিন্যাস করেন। ইকরামা বিন আবু জাহল (রাঃ) অগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব দেন। ডান দিকের দায়িত্বে ছিলেন হোজাইফা (রাঃ) এবং বাম দিকের কমান্ডার ছিলেন আরফাজা (রাঃ)। মাঝখানে ছিলেন উমানের স্থানীয় মুসলমানগণ।

তুমুল যুদ্ধ হল। বিল আখের মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেন। এ যুদ্ধে দশ হাজার দুশমন নিহত হয়। চার হাজার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মালে গনিমতের বিরাট বিরাট স্তুপ মদিনায় প্রেরণ করা হয়। এ যুদ্ধ শেষ করে তিনি খলিফার নির্দেশে আহলে মহরায় চলে যান। তিনি সেখানে পৌঁছে তাদেরকে পুনরায় দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। তাঁর আহবানে দুশমনদের একটি বড় অংশ ইসলাম কবুল করে। বাকীদের সাথে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে দুশমনদের সেনাপতি মসীহ নিহত হয়। এ যুদ্ধে ও মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেন।

তারপর তিনি খলিফার নির্দেশ মোতাবেক মুহাজির (রাঃ) এর সাহায্যে এমান চলে যান। ইকরামা (রাঃ) এমান পৌঁছার পূর্বেই নাজরান নামক স্থানে মুহাজির (রাঃ) এর সাথে মুরতাদদের যুদ্ধ বেঁধে যায়। তুমুল লড়াই করার পর মুরতাদদের নেতা কায়েস বিন মাকশুহ এবং আমর বিন মাআদিকারাবা মুজাহিদগণের হাতে গ্রেফতার হয়। উভয়কে বন্দী করে খলিফার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা মদিনায় পৌঁছে মুসলমান হয়ে যান। খলিফা তাদেরকে আযাদ করে দেন।

এ সকল অভিযানের পর তাঁরা বনু কেন্দার দিকে অগ্রসর হয়। বনু কেন্দার লোকেরা আশআছের নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গড়ে ছিল। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছা মাত্রই যুদ্ধ শুরু হল। দুশমনরা সম্মুখ

যুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে, দুর্গে আশ্রয় নিল। মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করল এবং দুশমনদের রসদ পত্র আসার রাস্তা বন্ধ করে দিল।

আশআছ অপারগ হয়ে মুহাজির (রাঃ) এর সাথে স্বন্ধি করল। সে নয়জন ব্যক্তি এবং তাদের পরিবার বর্গের জানের বিনিময়ে দুর্গের দরজা খুলে দিল। খোদার কি কুদরত আশআছ এ নয় ব্যক্তির লিষ্টে নিজের নাম লিখতে ভুলে গেল। সুতরাং মুসলমানগণ ঐ নয় ব্যক্তি ছাড়া সকলের সাথে আশআছকেও গ্রেফতার করলেন। এদের সবাইকে খলিফার দরবারে হাজির করা হলে সকলেই মুসলমান হয়ে যান।

মাত্র ১১ মাসের মধ্যে খলিফা আবুবকর (রাঃ) আরব ভূমি শত্রু মুক্ত করলেন। ১১ মাস আগে মক্কা, মদিনা আর তায়েফ ছাড়া সব স্থানে মুরতাদ ও শত্রুদের আস্তানা ছিল। ১১ মাস পর আরবের রঙ পাল্টে গেল, এখন আর কেউ ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে না। সকল স্থানে আমনো আমান সৃষ্টি হল। ১১ মাসে ইসলামী ইমারত মজবুত হল। এটা একমাত্র জিহাদের বরকতেই সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু যেমন ভারত আর আমেরিকা। তদানিন্দন সময়ে ছিল, রোম আর পারস্য। এ দুই পরাশক্তি সব সময় ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আঘাত হানার চেষ্টা করতো। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন গোলযোগ দেখা দিল। তখন এ দুই পরাশক্তির কুদৃষ্টি মদিনার উপর পড়ল। রোম সম্রাট হেরকাল ইসলামী ইমারতে আঘাত হানার জন্য শামদেশে সৈন্য সমাবেশ করল। এদিকে পারস্য তথা ইরানীরা ও মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। খলিফা ১১ বাহিনী প্রেরণ করার পূর্বেই উসামার নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ শামদেশে প্রেরণ করেন। আর মুসান্না বিন হারেসা (রাঃ) এর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ

ইরাক ইরানের দিকে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল, কোন এক স্থানে জমে থেকে যুদ্ধ করো না বরং গেরিলা কায়দা যুদ্ধ করো। যতদুর সম্ভব ইরানীদের কে ভয় দেখাও। এর দ্বারা খলিফার উদ্দেশ্যে ছিল ইরানীরা যেন মুসলিম জনবসতির দিকে অগ্রসর না হয়। খলিফা আবুবকর (রাঃ) মুসলিম এলাকা শান্ত করার পর এবার তিনি মন দিলেন পারস্য সম্রাজ্যের প্রতি।

খলিফা খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে ১৮ হাজার মুজাহিদ দিয়ে ইরাকে প্রেরণ করেন, তিনি ইরাক ইরানে সর্বমোট ২৫টির মত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সব গুলোতে তিনি বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধগুলোতে প্রায় দুই লক্ষ পারস্য ফৌজ মুসলমানের হাতে নিহত হয়। মুসলমানগণ বিশাল এলাকা দখল করে নেয়। হায়রা নামক স্থানে মারকাজ বানিয়ে এ সকল এলাকা শাসন করতে থাকে। এখানে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট ২০ হাজার। খালিদ (রাঃ) খলিফার নির্দেশে মুসান্না বিন হারেসা (রাঃ) এর কাছে দায়িত্ব ভার দিয়ে ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে শামের পথ ধরে।এদিকে খলিফা আরও ৫টি বাহিনী একের পর এক শামের দিকে প্রেরণ করেন। তাদের কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে- (১) ইকরামা বিন আবুজাহল (রাঃ), (২) আমর ইবনুল আস (রাঃ) (৩) ইয়াযিদ বিন আবু সুফয়ান (রাঃ) (৪) আবু উবাইদা (রাঃ) (৫) শুরাহবিল বিন হাসানা (রাঃ)।

আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর বাহিনী ফিলিস্তিনের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। ইয়াযিদ বিন আবু সুফ্য়ান দামেস্কের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাঃ) হিমসের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়। এবং শুরাহবিল (রাঃ) উরদুনের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়। খালিদ (রাঃ)

সহ ইয়ারমুকের ময়দানে সকলে মিলিত হন। মুজাহিদ সংখ্যা সর্বমোট ৪০ হাজারে দাঁড়ায়। এদিকে রোমান সৈন্যের সংখ্যা ৫ লাখে পরিণত হয়।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

১৩ হিজরীর জমাদিউচ্ছানী মাসের শেষ দিন গুলোর কোন এক সকালে ইয়ারমুকের ময়দানে যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) নিজের বাহিনীকে ছোট ছোট অনেক দলে বিভক্ত করেন, এবং প্রতি দলে একজন করে দক্ষ কমান্ডার নিযুক্ত করেন। আর ৪০ হাজার বাহিনী হতে কিছু বীর বাহাদুর বাছাই করেন, এরা হলেন স্পেশাল বাহিনী। এ বাহিনী নিজের হাতেই রাখেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই রোমানদের চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ার খুব তর্জন গর্জন করে মুসলমানের উপর আক্রমণ করে বসে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) তাঁর স্পেশাল বাহিনী দ্বারা তা প্রতিহত করেন।

এ সময় জারজা বিন যায়েদ নামে একজন রুমী সরদার হযরত খালিদ (রাঃ) কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ দল ত্যাগ করে মুসলমান দলে শামিল হন। তিনি হলেন সেই সকল ব্যক্তিদের একজন যিনি মুসলমান হওয়ার পর কোন নামায-রোজা না করেই শাহাদাত লাভ করেন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি খুব গরম। মুসলমানগণ জোহর ও আসরের নামায পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেল না। ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করতে হল। ৫ লাখ বাহিনীর সাথে মাত্র ৪০ হাজার লোকের মোকাবালা। দুশমনরা শকুনের মত চারপাশ হতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। মুসলমানগণ এত ব্যস্ত ছিল যে হার জিতের চিন্তা করার সময়টুকুও পেল

না। সকাল থেকে শুরু হয়ে বেলা অস্ত যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ হল, কিন্তু হার জিতের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আবু সুফয়ান (রাঃ) এ অবস্থা দেখে কবিতা আবৃতি করছিলেন এবং মুসলিম সেনাদলকে কাফিরদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রাঃ) এ অবস্থা দেখে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন,

হে মুসলমান! কে আছো! জান্নাত পেতে চাও। কে আছো! জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাও? কে আছো! আল্লাহর সাক্ষাত চাও। কে চাও যে তোমার জন্য জান্নাতে ৭০টি হুর বরাদ্দ হোক। তাঁরা আমার কাছে এসো। আমার হাতে মৃত্যুর উপর বায়াত হও। তোমাদের জন্য জান্নাত সাজানো হয়েছে। হুর গেলমানরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ঐ দেখ দুশমনরা তোমাদের দিকে ধেঁয়ে আসছে। এ আহবানে চারশত মুজাহিদ তাঁর কাছে মৃত্যুর উপর বায়াত হলেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন হয়ত বিজয়ের মালা ছিনিয়ে আনবেন, না হয় শাহাদাতের পিয়ালা পান করবেন। এ প্রতিজ্ঞার পর তাঁরা বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে দুশমনের উপর আক্রমণ চালালেন। সারাদিন সারারাত যুদ্ধ হল। ফজরের নামাযের সময় মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করলেন।

যুদ্ধ খতম হল, এক লক্ষ ত্রিশ হাজার খৃষ্টান মারা পড়ল। রক্তে সয়লাব হয়ে গেল ইয়ারমুকের ময়দান। খৃষ্টানরা পরাজিত হল। মুসলমানদের ঝান্ডা উড্ডীন হল কিন্তু ইকরামা (রাঃ) কে আর পাওয়া গেল না। তাঁর ছেলে আমর ইবনে ইকরামা (রাঃ) কে ও আর পাওয়া গেল না। অনেক সন্ধ্যান করার পর তাদেরকে শহীদগণের মাঝে পাওয়া গেল। আল্লাহ পাক ইকরামা (রাঃ) এর বায়াত কবুল করেছেন। তিনি জান্নাতে চলে গেছেন।

বন্ধুরা আমার! যে আবুবকর (রাঃ) কাফির মুরতাদদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে গেলেন। যে আবুবকর (রাঃ) এর শাসনকালকে মুরতাদ উৎখাতের শাসন কাল বলা চলে। যে আবুবকর (রাঃ) এর পাহাড় সম হিম্মতের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র টিকে ছিল। প্রায় সকল সাহাবায়ে কিরাম যখন মুরতাদদের বিরুদ্ধে এ্যাকশনে যাওয়া অপছন্দ করেছিলেন, আর আবুবকর (রাঃ) বলতে ছিলেন, আমি বেঁচে থাকব, আর দ্বীনের সামান্য ক্ষতি হবে তা বরদাশত করা যায় না।

নবী (সাঃ) এর কোন একজন সাহাবী ও যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের না হয়, আমি আবুবকর (রাঃ) একাই ওদের বিরুদ্ধে লড়ব। লড়তে লড়তে হয় আমি শেষ হয়ে যাবো, না হয় মুরতাদরা খতম হবে। কোন অবস্থাতেই দ্বীনের সামান্য ক্ষতি বরদাশত করা হবে না। যে আবুবকর (রাঃ) এর দৃঢ় মনোবলের কারণে ইসলাম ও মুসলমান মুরতাদদের হাত হতে রক্ষা পেল, সেই আবুবকর (রাঃ) কে আজ শিয়ারা মুরতাদ বলে।

আসলে গোড়া খোঁজলে দেখা যায়, ওরা খিলাফতে রাশেদার যুগের মুরতাদদের বংশধর। বর্তমান বিশ্বে শিয়ারা যেমন ভাবে সুন্নীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে, সুন্নী আলেমদের কে গুপ্ত হামলায় হত্যা করছে, তদ্রূপ খিলাফতে রাশেদার যুগেও তারা করেছিল। খিলাফতে রাশেদার শেষ অর্থাৎ উসমান ও আলী (রাঃ) এর যুগে ওরা অত্যাধিক সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রের শিকার হন মুসলিম বিন আকিল (রাঃ), হুসাইন (রাঃ), এবং তাঁর গোটা পরিবার বর্গ, আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সহ আরও বহু গুণীজন।

গোপন হত্যা (১)

কুখ্যাত ব্যক্তির বিখ্যাত সাজা

আওস ও খাজরাজ ভিন্ন দুটি গোত্রের নাম। মদিনায় তাদের বাস। ধর্মে কর্মে এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ উভয়ে তারা মুশরিক, ধর্মের ব্যাপারে তাদের মাঝে কোন সংঘাত নেই, সংঘাত শুধু আধিপত্য বিস্তার নিয়ে। যুগ-যুগ ধরে এ দু-গোত্রের মাঝে আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধ চলছে। কখনো আওস পরাজিত হয়, আবার কখনো এর বিপরীত হয়। এদের পিছনে অস্ত্রের যোগান দিচ্ছে মদিনার ইয়াহুদী গোষ্ঠী। ওদের ভাল করেই জানা যে, মুশরিক দলদ্বয়ের মাঝে ঐক্য হলে, ইয়াহুদদের অস্তিত্ব থাকবে না। চলবেনা ওদের মড়লিপনা। উভয় দল ইয়াহুদদের কাছে ঋণী হওয়ার ফলে, তারা ওদের সামনে মাথা হেড করে চলতো। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের কারণে, তাদের সর্বস্ব শেষ হতে যাচ্ছে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইতি মধ্যেই মদিনায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটলো। অন্ধকারাচ্ছন্ন মদিনায় হিদায়েতের প্রদীপ জ্বলে উঠলো। হিদায়েতের আলো ছড়িয়ে পড়লো পুরো মদিনায়, যে আলো থেকে বাদ পড়েনি আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ও। আওস ও খাজরাজ গোত্রের প্রতিটি সদস্যের হৃদয় আলোকিত হলো হিদায়েতের আলো দ্বারা। এ আলো হতে বঞ্চিত হলো শুধু অভিশপ্ত ইয়াহুদী গোষ্ঠী। আওস ও খাজরাজ ইসলাম গ্রহণ করে চির জান্নাতের সন্ধান পেল। ইয়াহুদ সম্প্রদায় আহলে কিতাব হয়েও জাহান্নাম কে আবাস্থল বানালো।

পূর্বের আলোচনার দ্বারা বুঝতে পারলাম, আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলাম গ্রহণের আগে যুগ-যুগ ধরে যুদ্ধ করে আসছিল। খারাপ কাজে হিরো হওয়ার জন্যে তাদের প্রতিযোগীতা হতো প্রতি মুহুর্তে। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের এ প্রতিযোগীতা বন্ধ হয়নি। তবে নীতির পরিবর্তন ঘটেছে। আগে প্রতিযোগীতা হতো খারাপ কাজে অগ্রগামী হওয়ার জন্যে। এখন প্রতিযোগীতা হয় ভাল কাজে অগ্রগামী হওয়ার জন্যে। সেই প্রতিযোগীতার অংশ হিসাবে আওস গোত্রের লোকেরা নবী (সাঃ) এর জানের দুশমন ইসলামের চির শত্রু কাব বিন আশরাফ কে হত্যা করলো। আওস গোত্রের লোকেরা সাময়িক ভাবে নেক কাজে এগিয়ে গেল। খাজরাজ গোত্রের লোকেরা সুযোগের অপেক্ষায় রইল। ইত্যবসরে কাংখিত সুযোগ এসে পড়লো।

আবু রাফে নামক এক ইয়াহুদী হুজুর (সাঃ) কে গালি দিতো। সে নবী (সাঃ) কে হত্যা করার প্রচেষ্টা সহ ইসলামকে দুনিয়া হতে মিটিয়ে দিতে সামান্যতম কসূর করেনি। যাদের কারণে খন্দকের যুদ্ধ সংগঠিত হয় ,আবু রাফে তাদের অন্যতম।

খাজরাজ গোত্রের লোকেরা অভিশপ্ত আবু রাফেকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক, আব্দুল্লাহ বিন আনিস, আবু কাতাহ (রাঃ) প্রমূখগণ হুজুর (সাঃ) এর কাছে আবু রাফে কে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। হুজুর (সাঃ) ও আগে থেকেই এমনটা ভাবছিলেন। কিভাবে তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করা যায়।সুতরাং খাজরাজ গোত্রের কিছু লোক অনুমতি চাইলে, হুজুর (সাঃ) খুশি মনে তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন।

বুখারী শরীফে তার কতলের বিস্তারিত আলোচনা বর্ণিত আছে। তা এখানে তুলে ধরা হলো। হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক ও আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা সহ কিছু সাথী আবু রাফে কে হত্যার জন্যে (তার বাড়ীতে) প্রেরণ করেন। (ছয় সদস্য বিশিষ্ট) সাহাবায়ে কিরামের দলটি (সন্ধার সময়) আবু রাফের দুর্গের অনতিদূরে উপনীত হলেন। এ সময় দলনেতা আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রাঃ) অন্যান্য সাথীবৃন্দকে বললেন, আপনারা এখানেই অবস্থান করুন ! আমি অগ্রসর হয়ে দেখি, কোন কৌশল অবলম্বন করা যায় কি-না? আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রাঃ) নিজেই বলেন, আমি (আবু রাফের দুর্গের কাছে এসে) দুর্গে প্রবেশ করার ফন্দি তালাশ করছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম তাদের এক গাধাঁ হারানো গিয়াছে। দুর্গের লোকেরা আগুনের মশাল জ্বেলে গাধাঁর সন্ধান করছে। (মশালের আলো চারদিক ছড়িয়ে পড়ছে)। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রাঃ) বলেন, আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, আমাকে কেউ চিনে ফেলল কি-না? (তাদের হাত হতে বাঁচার জন্যে কৌশল অবলম্বন করলাম) আমি নিজের মাথা ও পা ঢেকে, এমন ভাবে বসে পড়লাম, লোকে দেখলে অবশ্যই বলবে, যে আমি মল ত্যাগ করছি। এ সময় গেট দারওয়ান আওয়াজ দিল যাদের ইচ্ছা আছে দুর্গে প্রবেশ করার, তারা শীঘ্র দুর্গে প্রবেশ কর, আমি গেট বন্দ করে দিচ্ছি। আমি এ সুযোগে দুর্গে প্রবেশ করলাম। তারপর গেটের সাথে গাধাঁর আস্তাবলে আত্মগোপন করলাম। অনেক লোক আবু রাফের ঘরে রাতের খানা সারলো, পরে গল্প গুজবে মেতে উঠল। রাত্রের এক প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। শোরগোল বন্দ হলো, (নিস্তব্দতা নেমে এলো এক সময়)

আর কোন আওয়াজ শুনতে পেলাম না। আমি আস্তাবল হতে বের হলাম। আমি পুর্বেই দেখে ছিলাম সেই তাকটি, যেখানে দারওয়ান দুর্গের চাবি রাখত। সুতরাং বের হয়ে সর্ব প্রথম চাবিটি হাতে নিলাম, চাবি নিয়ে দূর্গের প্রধান ফটক খুলে নিলাম, উদ্দেশ্য ছিল দূর্গের কোন লোক আমাকে দেখে ফেললে, অতি সহজেই যেন আত্মরক্ষা করতে পারি। তারপর আমি একের পর এক ঘর অতিক্রম করতে লাগলাম, (অর্থাৎ তিনি আবু রাফের অট্টালিকার ফটক গুলো খুলে, তার বিশেষ বালাখানার দিকে যাচ্ছিলেন, যেখানে আবুরাফে ঘুমাতো)। আমি একের পর এক ফটক খুলে, ভিতর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছিলাম। অতপর সিঁড়ি দ্বারা উপরে উঠে আবু রাফের ঘরে প্রবেশ করলাম। অন্ধকার ঘর, আমি বুঝতে পারলাম না আবু রাফে কোথায় অবস্থান করছে। আমি বললাম, ওহে আবু রাফে! সে বলল, কে তুমি? আমি কোন উত্তর দিলাম না।

এবার আমি তার আওয়াজের প্রতি লক্ষ করে তার কাছে চলে গেলাম, এবং তার উপর আক্রমণ করে বসলাম। সে চিৎকার জুড়ে দিল, আমার এ আক্রমণে কোন ফায়দা হলো না। সে অক্ষত। আমি এবার তার সাহায্যকারী রূপে আবির্ভূত হলাম। আওয়াজ খানিক পরিবর্তন করে বললাম, আবু রাফে সাহেব! কি হলো আপনার? আবু রাফে আমাকে গোলাম ভেবে বলল, তোমার উপর আশ্চর্য-বোধ করবো না? তোমার মা ধ্বংস হোক! দুশমন আমার ঘরে প্রবেশ করেছে এবং আমার শরীরে তরবারী দ্বারা আঘাত করছে। আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রাঃ) বলেন, আমি আবার তার কাছে গেলাম, এবং দ্বিতীয় বারের মত তার উপর চড়াও হলাম, কিন্তু কোন ফায়দা হলো না (বরং ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিল) সে জোরে চিৎকার করল।

যার ফলে তার ঘরবাসী উঠে পড়লো। তিনি বলেন, এবার আমার আওয়াজ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে কোন নবাগত সাহায্যকারীর ন্যায় তার কাছে আবির্ভাব হলাম। তার সাথে কথা হলো। আমি বুঝতে পারলাম, সে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে খুব জোরে চাঁপ দিলাম, তরবারী তার পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তার মেরুদন্ডের হাড্ডি ভাঙ্গার আওয়াজ ও শুনতে পেলাম। এভাবে তার হত্যা করার কাজ সমাধা হলো। তারপর আমি ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে ঘর হতে বের হলাম। সিঁড়ির কাছে এসে নীচে অবতরণ করার ইচ্ছা করলাম, এমন সময় পড়ে গিয়ে আমার পায়ের পাড্ডি ভেঙ্গে গেল। আমার মাথার পাগড়ী খুলে পায়ে পট্টি বাধঁলাম।

লেংড়া পায়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে সাথী বৃন্দের কাছে উপস্থিত হলাম। সাথীদের কে বললাম তোমরা মদিনায় চলে যাও, এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে কতলের সুসংবাদ দাও! আমি তার নিশ্চিত মৃত্যু সংবাদ না শুনে এখান থেকে সরবো না। সকাল হলো, একজন ঘোষক দূর্গের প্রাচীরে উঠে আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ পরিবেশন করলো। মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আমি উঠে চললাম, এ সময় চলতে আমার কোন কষ্ট হয়নি। (অতিশয় আনন্দে ব্যথা অনুভব হয়নি) আমার সাথীরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছে পৌঁছার পূর্বেই (পথিমধ্যে) তাদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তারপর আমি নিজেই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে তার কতলের সুসংবাদ দিলাম এবং আমার পা ভাঙ্গার কথা জানালাম । হুজুর (সাঃ) আমাকে পা লম্বা করতে বললেন, আমি পা লম্বা করলে, তিনি আমার পায়ে তার মোবারক হাত বুলিয়ে দিলেন। পায়ের ব্যথা

একদম সেরে গেল। মনে হল এ পায়ে আর কখনো কোন আঘাত লাগেনি।

গোপন হত্যা (২)

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) এর অভিনয়

মদিনায় সংবাদ এলো, মুজাহিদ বাহিনী বিজয় লাভ করেছেন। কাফির বাহিনী পরাজিত হয়েছে। সত্তরজন কাফের সরদার নিহত। সওরজন গ্রেফতার। প্রতিটি মুসলিম ঘরে ঈদ উৎসব শুরু হলো। মক্কার কাফির বাহিনী পরাজিত হওয়ায়, ইয়াহুদী সরদার কা'ব বিন আশরাফ যার পর নাই দুঃখিত হল। মক্কায় গমন করে কাফির সরদারদের সাথে মত বিনিময় করল। কাব ও কুরাইশগণ কাবা ঘরের গিলাফ ধরে হলফ করে বলল আমরা মুশরিক ইহুদী ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানকে মদিনা থেকে সমূলে উৎখাত করবো। চুক্তি অনুযায়ী কাফির এবং মিত্র বাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

কা'ব বিন আশরাফ হুজুর (সাঃ) এর বিরুদ্ধে সাহাবীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে গোপনে অপমানকর কবিতা আবৃতি করতে লাগলো। যার ফলে নবী (সাঃ) এর ইজ্জত চরম ভাবে লুণ্ঠিত হচ্ছিল। হুজুর (সাঃ) ভাবতে ছিলেন, কেমনে কাব বিন আশরাফকে হত্যা করা যায়। তাকে হত্যা করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। কেননা হুজুর (সাঃ) জানতেন ইয়াহুদীরা মক্কার কাফিরদের সাথে চুক্তি করেছে, যে কোন সময় তারা

সম্মিলিত ভাবে মদিনায় হামলা করতে পারে। তখন প্রতিরোধ করা মুসলমানদের পক্ষে দুস্কর হয়ে পড়বে।

তৃতীয় হিজরী রবিউল আওয়াল মাস। সিদ্ধান্ত হল যে করেই হোক রাস্তার ময়লা সড়াতে হবে। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, কে আছো বীর বাহাদুর! যে কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করবে! সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) কে কষ্ট দিচ্ছে। বীর যোদ্ধা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল (রাঃ)! আপনি তাকে হত্যা করা পছন্দ করেন? রাসূল (সাঃ) বললেন অবশ্যই পছন্দ করি। মুহাম্মদ (রাঃ) বললেন আমাকে কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি দিন। হুজুর (সাঃ) বললেন যা করার বা বলার প্রয়োজনে বলতে পারো । রাসূল (সাঃ) এর কথা শুনে মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনন্দিত হলেন, তিনি কা'ব বিন আশরাফের বাড়ীতে গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। মুহাম্মদ (রাঃ) তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন এই যে এক বেটা (রাসূলুল্লাহ) মক্কা হতে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। আজ এ চাঁদা কাল ঐ চাঁদা আবার সদকা ফেতরার নামে যা করছে অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায়, আমাদের কে সত্ত্বর ফকির বানিয়ে ছাড়বে। তার চাঁদা পরিশোধ করার জন্য আমি তোমার কাছে কিছু ঋণ নিতে এসেছি, ধৃত কা'ব ঝুপ বুঝে কুপ দিল। সে মিটমিট হেসে বললো, ও হে মুহাম্মদ বিন মাসলামা ! খোদার কসম করে বলছি, তোমারা কি দেখেছো ? আরও বহুকিছু দেখবে। আজ তোমরা ফকির হয়েছো , সে দিন বেশি দুরে নয় যে দিন তোমরা মিসকিনে পরিণত হবে । মুহাম্মদ (রাঃ) বললেন, আমরা তাঁর অনুস্মরণ করেছি, আরও গুটি কয়েক দিন করবো। দেখি বেটা শেযতক করে কি ? আচ্ছা আপাতত

আমার সমস্যাটা দূর করো। আমাকে ৫ মন মাল দাও। কা'ব বললো ঋণ দিতে আমি প্রস্তুত আছি, তবে আমার কাছে তোমার প্রিয় বস্তু বন্দক রাখতে হবে। মুহাম্মদ এবং তাঁর অপর সাথী দুই জন সমস্বরে বললেন , বন্দক হিসাবে তুমি কি চাও? বদবখত খবিছুল বতন বললো, তোমাদের সুন্দরী মহিলাদের কে আমার কাছে বন্দক রেখো । বীর শ্রেষ্ঠ মুহাম্মদ (রাঃ) ক্ষোভ চাঁপা রেখে অভিনয়ের স্বরে বললেন, তুমি আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরতম ব্যাক্তি, তুমিই বলো? কেমন করে আমাদের রমনীদের কে তোমার কাছে রাখি! ওরা যদি তোমার প্রেমে পড়ে আমাদের কাছে না আসে। কা'ব বললো , এ সম্ভব না হলে তোমাদের বাচ্চা আমার কাছে রেহান রেখো। এমন কি করে হতে পারে ? আরবের লোকেরা বাহারি ডঙ্কা বাজাবে আর বলবে, কত নিকৃষ্ট ওরা । ৫/১০ মন মালের জন্যে সন্তান বন্দক রাখে যারা। এ ভৎসনা আমাদের জন্যে কতইনা অপমান কর হবে।

শেযতক সিদ্ধান্ত হলো কা'ব ঋণ দিবে । বিনিময়ে তার কাছে প্রচুর অস্ত্র জমা রাখা হবে । লেনদেনের স্থান নির্দারণ হলো কা'বের বাড়ী। সময় নির্দারণ হলো শেযরাত । নির্দারিত সময় যত ঘনিয়ে আসছে মুহাম্মদ (রাঃ) এবং তার সাথীদের চিত্রানন্দ বেড়ে যাচ্ছে। আখেরী রাত মুহাম্মদ (রাঃ), আবু নায়েলা (রাঃ) এবং অপর আরেক জন সাথী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কা'বের দরজায় কড়া নাড়লো । কা'বের সারা রাত ঘুম হয়নি । সে আনন্দে আত্মহারা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথীরা বেঈমান হচ্ছে বলে। আচ্ছা সে যাই হোক। কা'ব তাদের কে কেল্লায় প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে দ্রুত নীচে নেমে এলো । কা'বের বিবি চিৎকার দিয়ে বললো রাতের নিশিতে তুমি কোথায় যাচ্ছো? আমি তো

ওদের আওয়াজে খুনের গন্ধ পাচ্ছি। কা'ব শান্তনা স্বরূপ বললো , ভয়ের কারণ নেই ওরা তো আমার লোক, মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার দুধ ভাই আবু নায়েলা । ভদ্রলোক কে রাতের গভীরে যুদ্ধের ময়দানে আহবান করলেও সাড়া দিতে হয় । কা'ব নীচে এসে বললো , মুহাম্মদ এসো! ভিতরে এসো ! কৌশলী মুহাম্মদ (রাঃ) পূর্ব হতেই নিজের সাথীদ্বয়কে তা'লিম দিয়ে ছিলেন । কিভাবে তাকে হত্যা করতে হবে ॥ কা'ব চাদর মুড়ি দিয়ে মুহাম্মদ (রাঃ) ও তাঁর সাথীদ্বয়ের অতি নিকটে এলো। এ সময় তার শরীর হতে খুশবু ছড়াচ্ছিল । মুহাম্মদ (রাঃ) কা'বকে বললেন, এমন খুশবু কোনদিন দেখিনি। কোথায় পেলে এ খুশবু? কা'ব বললো আরব সরদারের কন্যা আমার ঘরে । আপাদমস্তক তার আতরেই সুরভিত, চেহারা ছবিতে বিশ্ব সুন্দরী। সে সর্বদাই এ আতর ব্যবহার করে থাকে। আমি তার কাছ থেকে এনেছি। মুহাম্মদ (রাঃ) বললেন, তুমি অনুমতি দিলে তোমার মাথা থেকে একটু ঘ্রাণ গ্রহণ করে ধন্য হতাম । কা'ব বললো ঠিক আছে-ঠিক আছে, মুহাম্মদ (রাঃ) নিজে সেই ঘ্রাণ উপভোগ করলেন। সাথীদেরকে ঘ্রাণ লওয়ার সুযোগ দিলেন। আবার বললেন ওদের জন্যে অনুমতি আছে তো? কা'ব বললো, হ্যাঁ! অনুমতি আছে। এবার মুহাম্মদ (রাঃ) তার মাথা মজবুত করে ধরলেন এবং ইঙ্গিতে সাবার করার নির্দেশ দিলেন। এক সাথে ২/৩ টি তরবারী আঘাত হানলো । খোদার দুশমন টু শব্দ পর্যন্ত করার সুযোগ পেল না ।

এভাবে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের দুশমন কে খতম করতেন । মানুষ কল্পনা ও করতে পারতো না হত্যাকারী কারা । বড় বড় দুশমন গোপনে হত্যা করতেন । যার ফলে কোন ফেতনা বরপা হতো না কিন্তু

আজ আমরা এর বিপরীত করছি। দুশমনকে নিপাত করার চেষ্টা না করে বক্তৃতা-বিবৃতির উপর ইকতেফা করছি। যার ফলে দুশমন সক্রিয় হয়ে ষড়যন্ত্র করে মুসলিম ছদ্মবেশে আমাদেরকে হত্যা করছে। আমার বার বার একটি আয়াতের কথা মনে পড়ছে। আল্লাহ্ পাক বলেন

فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ

অর্থঃ- "তোমরা কাফির সরদারগণকে হত্যা করো" দুশমন বাহিনীর শক্তির উৎস হলো এরা। মুসলমানগণ যদি উল্যেখিত এই ছোট একটি আয়াতের উপর ও আমল করতো, তাহলে আজ তাদের এ দূর্গতি হতো না। ক্ষমতা-নেতৃত্ব তাদের হাতেই থাকতো। আসুন! আমরা সকলে মিলে এ আয়াতের বাস্তবায়ন করি।

মরেও অমর

১৭ শত সালের কথা। ভারত বর্ষে চলছে ইংরেজদের দুঃশাসন। ধ্বংস করছে একের পর এক মুসলিম ঐতিহ্য। মাদ্রাসা মসজিদ গুলো পরিণত করেছে ঘোড়ার আস্তাবলে। মুসলিম দূর্গ সমূহে, শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদ গুলোতে ফাঁসির কাষ্ট নির্মাণ করেছে। যেখানে প্রত্যহ আশিজন আলেমকে ঝুলানো হতো। প্রতিটি মুসলিম ঘর ওদের ক্লাব। ওদের পাশবিক নির্যাতনের উদ্যান। উপমহাদেশের কোন একটি গাছ বলতে পারবে না যে, আমার ডালে কোন মুসলিম ঝুলেনি।

স্বাধীনতার সূর্য যতবার অন্ধকার বিদীর্ণ করে পূর্বাকাশ আলোকময় করে, তাওহিদী জনতার মাঝে আসার সন্ধ্যার করেছে। ইংরেজ জালেম ও ওদের লেজ চাঁটা হিন্দু ও কতিপয় নামধারী মুসলমান স্বাধীনতার রবিকে অস্তমিত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। যারা আপন-আপন

দেহের শেষ রক্ত বিন্দু খরচ করে, জিহাদের ঝান্ডা উড্ডীন করে স্বাধীনতার সূর্যকে উর্ধগামী রেখে ছিলেন, তাদের অন্যতম হলেন শাহ্ ঈসমাইল শহীদ এবং তাঁর আধ্যাত্মিক, পীর সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (রঃ)। উভয়ে বালাকোটের রনাঙ্গণে শত শত লাল কুকুর কে জাহান্নামে প্রেরণ করে শাহাদাতের পিয়ালা পান করেন।

সাইয়্যিদ আহমদ শহীদের একজন শিষ্য ইংরেজ জালেমদের তোপের আঘাতে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করেন। নাম তাঁর বেদার মগ্জ। বেদার মগ্জের শাহাদাতে তাঁর মাতা-পিতা খুবই মর্মাহত হন। তাঁর মাতা-পিতার আহাজারীতে জালেম কাফিররা পর্যন্ত কেঁদেছিল। আমার মনে হয় আল্লাহর্ আরশে ও স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে ছিল। যাহোক, তাদের দিনের সময়টুকু কোন মতে অতিবাহিত হলেও রাত খুবই কষ্টের হতো। এক রাত সাত রাত মনে হতো। নিথর নিঝুম রজনীতে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার পানির মত ওদের চক্ষু হতে অশ্রু প্লাবিত হতো। জায়নামাজে বসে রাতের পর রাত মাসের পর মাস কাঁদতে কাঁদতে পিতার চক্ষুদৃষ্টি লোপ পেল।

এবার সাক্ষাতের পালা। কোরআনের বানী মিথ্যে হতে পারে না। নিশিরাত চারদিকে নিস্তব্দ। অন্ধকারে ডুবে আছে সারা পৃথিবী। মৃদু বাতাস বইছে বাড়ীর চারদিকে। মাতা-পিতা অন্ধকার কুঠোরীতে বসে আল্লাহ্র কাছে আরাধনা করছেন,

হে আল্লাহ্! আমার ছেলের শাহাদাত কবুল করো। তাকে জান্নাতের স্বর্বোচ্চ মাকাম দান করো। এদেশ ইংরেজ মুক্ত করে? হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়লো। একি, গভীর রজনীতে কে এলো? কাকে চায়? আমার ঘরে কেন? ভাবতে ভাবতে পিতা দরজা খুলে দিলেন, তামাম

অন্ধকার ভেঙ্গে নুরের প্রদীপ হাতে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো বেদার মগজ। তার ডান পাশে সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ এবং বামে ইসমাইল শহীদ (রঃ)। পিতা অবাক হলেন! একি স্বপ্ন নাকি বাস্তব! আচ্ছা আমি তো ঘুমাইনি, ঝিমাইওনি। তাহলে এটা কি হচ্ছে। পিতা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বেদার মগজের আম্মাকে ডাকলেন। আম্মা অশ্রুভেজা নয়ণে বললেন এতো বেদার মগজ। ও মরেনি। ঘরে ফিরে এসেছে। সাথে দু'জন মেহমানও রয়েছে। আপনি ওদের বসতে দিন। আমি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করছি। তিন শহীদ পিতার জায়নামাজে বসলেন। শাহ আহমদ শহীদ (রঃ) বেদার মগজের পিতাকে শহীদের মর্যাদা বর্ণনা করে অনেক বুঝালেন, শান্তনা দিলেন।

অবশেষে পিতা বললেন, বেদার মগজের শাহাদাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি জানতে চাই কোথায় আঘাত লেগে আমার ছেলে শহীদ হলো, আমি সে স্থানটি দেখতে চাই। শাহ্ আহমদ শহীদের আদেশক্রমে বেদার মগজ তাঁর ক্ষত স্থানটি দেখালেন। বেদার মগজ মাথার পাগড়ী খুলে দিলেন। মাথা থেকে পাহাড়ী ঢলের মত খুন ঝড়তে লাগলো। জায়নামাজ রক্তে রঙ্গিন হয়ে গেল। পিতা এ অবস্থা দেখে চৈতন্য হারালেন। শহীদগণ স্থান ত্যাগ করলেন। প্রত্যুষে পিতার জ্ঞান ফিরলে, কালবিলম্ব না করে, ইয়াকুব নানুতবী (র ঃ) এর দরবারে হাজির হলেন, এবং রাতের অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। তাঁর সামনে রক্ত মাখা জায়নামাজ ও উপস্থিত করলেন। ইয়াকুব নানুতবী জায়নামাজ চুম্বন করতে করতে আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন, এবং বেদার মগজের পিতাকে সান্তনা দিতে গিয়ে বললেন, আপনি ভেবে ছিলেন

বেদার মগজ মৃত্যু বরণ করেছে। আসলে ও জীবন ফিরে পেয়েছে। কেননা আল্লাহ্ পাক শহীদগণ কে মৃত বলতে নিষেধ করেছেন।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ الخ

অর্থঃ যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যু বরণ করে তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা জাননা।

একজন বালক মুজাহিদের শাহাদাত

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

অর্থঃ "যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদের মৃত বলো না; বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝনা।"

ইসলামের বিভিন্ন দিক আছে। যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইত্যাদি। এ সকল ইবাদত আদায় করতে হয়ত শারীরিক পরিশ্রম হয় কিংবা আর্থিক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এমন একটি বিধান, যেখানে জান মাল উভয়টাই ব্যয় করতে হয়।

মাথা ছাড়া যেমন দেহের অস্তিত্বের চিন্তা করা যায় না, ঠিক তেমনি জিহাদ বিনে ইসলামের প্রকৃত অস্তিত্বের কথা চিন্তা করা যায় না। এর প্রমাণ বর্ত্তমান বিশ্বের ইসলাম ও মুসলিম চিত্র। স্পেন, কানাডা, রাশিয়ার মুসলমানগণ জিহাদ ত্যাগ করার কারণে বিশ্বের মানচিত্র থেকে তারা ঝড়ে গেছে। আজ সেখানে শয়তানদের প্রভুত্ব চলছে। আর তার বিপরীতে আফগানিস্তান, চেচনিয়া, বসনিয়ার মুসলমানগণ জিহাদকে আকড়ে ধরার কারণে, বিশ্বের মানচিত্রে স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

জিহাদের কাফেলা

আফগানিস্তান সম্পর্কে বলতে হয় যে, সে আজ তামাম কুফুরী শক্তির জন্য হুমকি স্বরূপ। তাঁদের এ গৌরবোজ্জ্বল বর্তমান পরিস্থিতি এমনিতেই অর্জিত হয়নি, আফগানীদের এ বিজয় অর্জন করতে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। ষোল লক্ষ্য শহীদের রক্তে রঞ্জিত করতে হয়েছে আফগানী রাজপথ।

শাহাদাতের আকাঙ্খায় বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম দেশ থেকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ। সেই জানবাজ মুজাহিদদের একজন হচ্ছে, শহীদ আব্দুল্লাহ; তাকে নিয়েই আজকের এ লেখা।

১৯৭৯ সালে রাতের অন্ধকারে বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তি রাশিয়ার সাড়ে তিন লক্ষ্য সেনা নামের হায়েনারা আফগান নিরীহ ও নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অপরাজেয় আফগানরা ও ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্নরক্ষা ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে।

পাকিস্তানের অধিবাসী একটি ফুটফুটে কিশোরের নাম আব্দুল্লাহ। বয়স তাঁর মাত্র চৌদ্দ বছর। শাহাদাতের আকাঙ্খায় আফগান জিহাদে শরীক হওয়ার ইচ্ছা করলো। আব্বার কাছে অনুমতি চাইলো। আব্বা রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।"ছোট বাচ্চাদের কিসের জিহাদ? লক্ষ-কোটি মুসলিম যুবক বসে আছে, জিহাদ ফরয হলে, আগে ওদের উপর ফরয হবে।" আব্বার কাছে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আম্মার কছে সে তাঁর আরজি পেশ করে বলল, আম্মু! আফগানিস্তানে আমার আরও লক্ষ লক্ষ মা, বোন আছে, যারা রুশ হায়েনা কর্তৃক নির্যাতিতা, নিস্পেষিতা, নিগৃহীতা, আমি তাদের সাহায্যে জিহাদে যেতে চাই। মা বললেন, বাবা! তোমার এখনও জিহাদের সময় হয়নি। তুমি জিহাদে গিয়ে শহীদ হলে, তোমার আব্বার এই বিশাল অট্টালিকায় কে বাস করবে? " কিন্তু মায়ের এ কথায় সে সন্তুষ্ট হতে পারল না।

শুক্রবার রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। বালক আব্দুল্লাহ সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে আফগানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। একাধারে একদিন একরাত চলার পর সে এক মুজাহিদ ক্যাম্পে পৌঁছলো। ক্যাম্পের পাহারাদারগণ তাকে

কমান্ডার সাহেবের কাছে নিয়ে গেলেন। কামান্ডার সাহেব তাকে বুঝিয়ে পুনরায় পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলেন।

বাড়ী ফেরার কয়েকদিন পরের কথা। শক্রবার ইমাম সাহেবের মুখ হতে وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ আয়াতের ব্যাখ্যা শুনলো। ইমাম সাহেব বললেন- আল্লাহ্ পাক অত্র আয়াতে শহীদদের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্যেখ করেছেন। যথা ঃ (১) আল্লাহ্ পাক বলেছেন, শহীদগণকে মৃত বলো না, মৃত বলা তো দূরের কথা 'মারা গেছে' এ ধরণের ধারণাও করবে না। আসলে তারা জীবিত । (২) শহীদ ব্যক্তির শাহাদাত লাভের সাথে সাথে আল্লাহ্ তাদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন।

উপরোক্ত কথাটির স্বপক্ষে হাদীস আছে, আবু দাউদ (রাহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, উহুদের যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ্ পাক তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পালকের ভিতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো ইরশাদ করেন, "মুজাহিদগণ যে বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন, তাদেরকে সেই বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। (৩) আল্লাহ্ তাদেরকে যে নেয়ামত দান করবেন তার মধ্যে তাঁরা সদা সর্বদা আনন্দমূখর থাকবেন। (৪) শহীদগণ যখন নিজেদের শান্তিময় জীবন প্রত্যক্ষ করবেন তখন বলবেন হায় আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত আমাদের এ শান্তি জীবন সম্পর্কে তাদেরকে কেউ যদি জানিয়ে দিত তবে তারা আমাদের জন্য দুঃখ করতেন না; বরং তারাও জিহাদে অংশগ্রহণ করে শাহাদাত বরণ করতেন। শহীদদের এই আকাঙ্খাও আল্লাহ্ পাক পূর্ণ করেন, তাদের সম্পর্কে সকলকে জানানোর মাধ্যমে। যেমন- কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ আর যারা এখনো আল্লাহ্র

কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। (সূরাহ ঃ আলে ইমরান)।

কিশোর আব্দুল্লাহ এই নসীহত শোনার পর জিহাদে যাওয়ার জন্য পুণরায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাঁর আব্বা অবস্থা বেগতিক দেখে আব্দুল্লাহর পায়ে শিকল লাগিয়ে বদ্ধঘরে খুটির সাথে বেঁধে রাখলো। আব্দুল্লাহ কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করলো, হে আল্লাহ! আমি মুসলমানের কাছে বন্দী আমি নিজ ঘরে বন্দী, আমাকে মুক্ত করো। আমি শাহাদাত বরণ করে তোমার কাছে হাজির হতে চাই। বন্দী অবস্থায় কয়েকদিন থাকার পর আব্দুল্লাহ অভিনব কৌশল অবলম্বন করলো। সে তাঁর আম্মাকে জানালো যতদিন তাকে বন্দী অবস্থায় রাখা হবে সে অনাহারে থাকবে। যেমন কথা তেমন কাজ, আব্দুল্লাহর অনশন দু'দিন চলল। তাঁর আম্মার ভালবাসার সাগরে ঢেউ খেলে গেল। গভীর রাত, মা ছেলের পাশে বসে কাঁদছেন, মা বললেন, "বাবা! তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি, তবুও তুমি আহার কর।" মা খুটির বাঁধন খুলে দিলেন, এখনো পায়ে শিকল লাগানো আছে, সে এক লাফে দরজা খুলে চম্পট দিল। পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে সেই পূর্বের ক্যাম্পে পৌঁছলো। তখন ক্যাম্পে পাহারাদারগণ ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলো, কমান্ডার সাহেব কোথায়? পাহারাদার জানালেন গজনীতে এ্যাম্বুসে গেছেন। রুশদের একটি শক্তিশালী সেনা ছাউনীর উপর আক্রমণ করবেন। আব্দুল্লাহ শাহাদাতের তামান্নায় জিহাদের গান গাইতে গাইতে (চলো মুজাহিদ চলো চলো জিহাদের ময়দানে চলো,শহীদের ঈদগাহে চলো) একাকী রণাঙ্গণের দিকে চললো। রণাঙ্গনে পৌঁছার পূর্বেই রুশ ভল্লুকের এক ঝাঁক মর্টার তোপ আব্দুল্লাহর বুককে ঝাঁঝরা করে দিল। আব্দুল্লাহর বাসনা পূর্ণ হল, মুজাহিদগণ রুশদের দূর্গ জয় করলেন। কিন্তু তাঁর দাফনের কোন ব্যবস্থা হলো না। কারণ

তাঁর শাহাদাতের খবর মুজাহিদদের জানা ছিল না। আর তাঁর মা-বাবা ভাবছেন তাদের ছেলে কোন মুজাহিদ ক্যাম্পে আছে।

এদিকে এভাবে একমাস চলে গেল, একমাস পর তাঁর আম্মা স্বপ্নে দেখলেন যে আব্দুল্লাহ বলছে আম্মা! আমি শহীদ হয়ে গেছি। আপনারা কি আমাকে দাফন করবেন না? মা, এই ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে হাউ-মাউ করে কেঁদে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। এমনিভাবে পর পর তিনদিন স্বপ্ন দেখার পর, স্ত্রীর অনুরোধে গৃহস্বামী ছেলের খোঁজে আফগানিস্তান গেলেন। মুজাহিদ ক্যাম্পে খোঁজ নিলেন; কিন্তু তাঁর কোন হদীছ পেলেন না, একজন পাহারাদার বললো, "এক মাস আগে একটি বালক এসেছিল। তারপর কোনদিক গেছে সে কথা আর বলতে পারব না।"

শত্রু কবলিত এলাকা, পিতা কোথায় খুঁজবেন? ছেলের বিরহে শিশুর ন্যায় ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন। লোকটির করুণ আর্তনাদের প্রেক্ষিতে মুজাহিদগণ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বালকটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন॥ অনেক খোঁজাখুজির পর এক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর লাশ অক্ষত অবস্থায় পেলেন। এখনও তাঁর পায়ে শিকল, দেহ থেকে রক্ত ঝরছে, মনে হল এই মাত্র যেন সে শাহাদাত বরণ করেছে। মুজাহিদগণ তাকে শিকলসহ কবর দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। কারণ, হাদীছে আছে শাহাদাতের সময় শহীদের গায়ে যে সকল জিনিস থাকবে, সেগুলো সহ তাকে দাফন করতে হবে, কিন্তু বালকটির বাবা বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন, তাকে যেন শিকল খুলে দাফন করা হয়। তিনি বললেন,"দেখুন, আমি পিতৃস্নেহের বশবর্তী হয়ে তাকে জিহাদে যাওয়া থেকে বাঁধা দানের উদ্দেশ্যে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে ছিলাম। কিন্তু আল্লাহর মর্জি যে, তিনি আমার এই একমাত্র সন্তানকে কবুল করেছেন। সে শহীদ হয়েছে, এতে আমার কোন আফসোস নেই। তবে আমি তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলাম, এর জন্য অনুতপ্ত। আজ যদি তাকে শিকল পরিহিত অবস্থায় দাফন করা হয়, তাহলে সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে এই

শিকল পরিহিত অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তখন আমি কি জবাব দিবো?

পিতার এহেন কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয়ের প্রেক্ষিতে মুজাহিদগণ শহীদ বালকের পা থেকে শিকল খুলে দেন এবং আফগান রণাঙ্গনেই এই জানবাজ বালক মুজাহিদকে দাফন করেন। সাহাবীগণের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা ছিল বলে তাদের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকলেই সর্বদা জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। অপর দিকে আজ মুসলমানদের মধ্য থেকে জিহাদী প্রেরণা বিলীন হয়ে গেছে বলে তাদের তরুণ ও জোয়ানরা পর্যন্ত জিহাদকে ভুলে বসেছে। এমনকি জিহাদকে সন্ত্রাস আখ্যা দিচ্ছে, কিন্তু অমোঘ সত্য হলো যে, বর্তমান বিশ্বের দিকে দিকে মুসলমানগণ নির্যাতিত, নিস্পেষিত ও নিগৃহীত হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। এই দিকে ইঙ্গিত করে প্রিয়নবী (সাঃ) ইরশাদ করেন "যখন তোমরা জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও বেইজ্জতী তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। যতক্ষণ না তোমরা দ্বীনের দিকে অর্থাৎ জিহাদের দিকে ফিরে আসবে।"

সুতরাং দ্বীনের অন্য সকল খিদমত আনজাম দানের সাথে সাথে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আনজাম দেয়া জাতির জিম্মাদারদের বিশেষ দায়িত্ব। যেন কাফের-বেদ্বীনের মোকাবালায় সশস্ত্র জিহাদের জজবা প্রত্যেক মুমিন নিজের দিলের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেন এবং সম্ভাব্য প্রস্তুতি গ্রহণে তৎপর হন॥ কারণ এতটুকু জজবা দিলের মধ্যে না থাকলে নিফাকের একটা অংশের উপর মৃত্যু হওয়া সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। জিহাদের ব্যাপকতার মধ্যে অন্যান্য আমল শামিল থাকার এ অর্থ নয়, যে তার দ্বারা সশস্ত্র জিহাদের ফরজ দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। সূরাহ আনফাল ও সূরাহ তাওবার অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করলে এ কথা দ্বিপ্রহরের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।